নবযুগের মানুষ

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়
৬।১ বি, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা

"নবযুগের মানুষ" গ্রন্থখানা
কালিদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
৬।১বি, ঈশ্বর মিল লেন
শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয় হতে
প্রকাশিত হয়েছে।

"নবযুগের মানুষ" গ্রন্থখানা
শ্রীমণীন্দ্র নাথ ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক
ইন্দুনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫বি, রায় বাগান ষ্ট্রীট হতে
মুদ্রিত হয়েছে।

দাম :

প্রথম সংস্করণ
১লা সেপ্টেম্বর
১৯৪১

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব

জর্জ্জ দি ফিপ্‌থ্‌ প্রফেসার

ও

ভারতের বরেণ্য দার্শনিক

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের করকমলে।
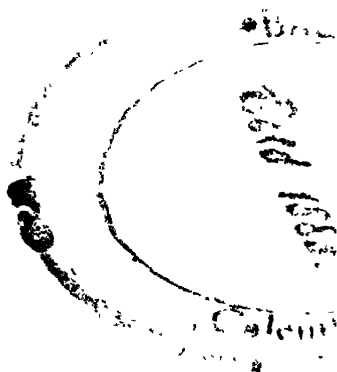
নিবেদন

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে 'শিক্ষাতীর্থের' যে সকল সদস্যের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি—তার মধ্যে বীরেন মুখোপাধ্যায় ও রণজিৎ সিংহ দেব রায়ের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁর নানা অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রন্থখানার ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু রায়, মদীয় ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত অমিয়মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ ভৌমিক মহাশয় নানাভাবে এই কর্ম্মে আমাকে সহায়তা করেছেন ; তাদের প্রত্যেকর কাছেই আমি ঋণী। যে সকল মনীষী "বাণী" পাঠিয়ে আমাকে একাজে উৎসাহিত করেছেন - তাদের কাছেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে মদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় ও তদ্বন্ধু শ্রীযুক্ত রণজিৎ সেনগুপ্তের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রকৃত পক্ষে তাদের প্রেরণা, উদ্যম ও সাহচর্য্যের ফলেই এ গ্রন্থখানি নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলো, ইতি —

লেখক হরিদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

I have had opportunities of meeting Swamiji once or twice. And his presentation of our cultural aspirations and religious truth to western audiences elicited great praise from his varied audiences. Many of us in India also have benefited from his writings.

—Sir S. Radhakrishnan
Madras, 20th June, 1941.

I am very glad to learn that a book dealing with the life and achievements of Swami Abhedananda is being published. I had the great pleasure of meeting the Swamiji at the Ramkrishna Vedanta Ashram at Darjeeling in 1932 and was deeply impressed by his learning and personality. His services to India in popularising her culture and religion abroad were undoubtedly of a memorable character.

Sir C. V. Raman
Bangalore 5th Aug. 1941.

দেশের এই দুর্দ্দিনে মহাপুরুষদের জন্মগ্রহণের যতখানি প্রয়োজন, তাঁহাদের জীবনী প্রচারের প্রয়োজনও ততখানি। স্বামী অভেদানন্দ ভারতের মহাপুরুষদের অন্যতম। অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিরাট দার্শনিক প্রতিভাই যে তাঁহাকে বড় করিয়াছে তাহা নহে। মানুষ হিসাবেও তিনি অতি উচ্চস্তরের। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তিনি এতই সুপরিচিত যে তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই।

তাঁহার জীবনী লিখিয়া গ্রন্থকার দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছেন, নিজেও ধন্য হইয়াছেন।

—দার্শনিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীরামপুর, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪১

ভারতের আর্যসংস্কৃতি যেমন প্রাচীন তেমনই গভীর ও সর্বতোমুখী। কি বৈদিক, কি ব্রাহ্মণ্য, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকল ধর্মের সার্থকতা শিক্ষায়, এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এক একটা উন্নত আদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবন গঠন। শিক্ষার প্রণালীগুলি সম্প্রদায়ভেদে পৃথক্ পৃথক্ মনে হ'লেও, উহার মূলনীতি এবং শেষ লক্ষ্যগুলি একই। ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতদ্বৈধ থাকলেও মনোমালিন্য ছিল না; প্রতিযোগিতা ছিল বটে, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণতা ছিল না। তাঁদের বহুশ্রুতিতা, বহুদর্শিতা, কর্মতৎপরতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিপুল সাধনার ফলে এদেশে এবং ভারতের বাহিরের অপরাপর দেশে আর্যসংস্কৃতির এক বিরাট অবদান গড়ে উঠেছিল মানবমনের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য। আজিও এই অভিযানের নিদর্শনগুলি বহুজাতির ভাষায়, চিন্তায়, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে ও দৈনন্দিন জীবনে পরিস্ফুট আছে।

এই ধর্মশিক্ষার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ সবরকম দাসত্ব হতে—যেমন জাগতিক তেমন আধ্যাত্মিক। জড়ের উপর চৈতন্যের বা চিত্তের নির্ভরতাই এই দাসত্বের প্রকৃত কারণ। তাই অর্থশাস্ত্রেও এই কথাই স্বীকৃত হয়েছিল যে আর্যগণের মধ্যে দাসত্ব নাই: নত্বে আর্য্যেষু দাসভাবঃ। তাই এদেশের রাজনীতিজ্ঞ অর্থশাস্ত্রকারগণ বহুপূর্বে দাসত্ব হতে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানেও এদেশ সকল দেশের অগ্রণী হয়ে উঠেছিল। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, গণিত প্রভৃতি তারই অকাট্য প্রমাণ। এই সংস্কৃতির অখণ্ডনীয় আধাররূপে পুঁথিগুলি ছিল বলে আজ আসুরিক শক্তিতে গর্বিত জাতিগণ আমাদের অসভ্য ও অশিক্ষিত বলে প্রমাণ করতে পারে নি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামী তাঁর স্বরচিত বহু গ্রন্থে এবং বহু অভিভাষণে এই সংস্কৃতির বিশালতা

গভীরতা এবং অমর বার্ত্তা আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের নানাস্থানে প্রচার করেছিলেন। আজ তাঁরই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত 'শিক্ষাতীর্থের' সদস্যগণ 'নবযুগের মানুষ' নাম দিয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করতে অগ্রসর হয়েছেন তা' অবশ্যই আমাদের সকলের কাছে যেমন আদরণীয় ও উপাদেয়—তেমন প্রেরণাপূর্ণ ও মনীষামণ্ডিত হবে আশা করতে পারি। সর্ব্বধর্মসমন্বয় ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ একই সুরে তাঁর শিষ্যগণও জগতের নিকট ঐক্যের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। পথ বিভিন্ন, কিন্তু গন্তব্যস্থান একই। 'নবযুগের মানুষ' যদি বনের মানুষ না হয়ে মনের মানুষ হয়, তবে তাঁর এই শাশ্বত বাণীতে মানুষ উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারে না। বিশ্বের বুকের উপর যত ঝঞ্ঝাই বয়ে যাক না কেন, যখনই প্রলয় ঘটা প্রশমিত হবে, তাঁর এই অকাট্য বাণীর সারবত্তা উত্তরোত্তর উপলব্ধি হবেই হবে। অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে 'নবযুগের মানুষ'কে সমাদরে অভ্যর্থনা করছি।

— অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া
এম-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
কলিকাতা, ৩০শে জুলাই, ১৯৫১

'শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়' কলিকাতায় অবস্থিত কতকগুলি কলেজের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান যদ্যপি শৈশব অতিক্রম করে নাই, তথাপি ইহা অনেক সদনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জীবনী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান সাধারণের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের বিষয় হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দজী পাশ্চাত্যজগতে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টধর্ম্ম যাজকদের প্রতিকূলতা ব্যর্থ করিয়া যে অসামান্য মনীষা ও শৌর্য্যের প্রমাণ দিয়াছেন

তাহা এতদ্দেশবাসী সকলেই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ করিতে বাধ্য। সর্ববিধ দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে হতবীর্য জাতির মধ্য হইতে কেমন করিয়া এরূপ অকুতোভয় মহামনীষী পুরুষসিংহের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে—তাহা চিন্তার বিষয়। এই জীবনী পাঠে পাঠক এই সমস্যার সমাধানের উপাদান পাইবেন আশা করি। এই জীবনী রচনা তখনই সার্থক হইবে যখন আমরা স্বামিজীর শক্তির উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে পারিব। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি—বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ যদি এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্ত গঠন করিয়া স্বামীজির শক্তিমন্ত্র ও ত্যাগের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়—জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইবে এ বিষয়ে আমার ভরসা রহিল।

অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
এম-এ, পি-এইচ্-ডি
কলিকাতা, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪১

কলেজের কতিপয় ছাত্র সুধীজনবরেণ্য স্বামী অভেদানন্দের জীবনী প্রকাশ কচ্ছেন—অতি আনন্দের কথা।

যাঁর বুদ্ধি ছিল জ্ঞানে প্রদীপ্ত, সাধনায় বোধি ছিল প্রস্ফুট, হৃদয় ছিল আত্ম-প্রসাদে পূর্ণ, ইচ্ছা ছিল বিশ্বমানবের সেবায় তৎপর, কর্ম্ম ছিল বেদান্ত-বাণী প্রচার, সেই স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিতে এই শ্রদ্ধার অবদান বাংলার ছাত্রসমাজের শুভ্র অন্তরের উজ্জ্বল বিকাশ। মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। জীবন মৃত্যুঞ্জয়ী। অভেদানন্দের স্মৃতির হোমশিখা বাংলার ছাত্রসমাজের ভেতর পবিত্রতা, শুচিতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি ভগবদ্‌ভক্তি জাগাইয়া তুলুক। জীবন-প্রভাতের অরুণালোকে এই মহাপুরুষের স্মৃতিকে বরণ করে', পূত ও নিবেদিত হয়ে, তাঁর ভর্গ-জ্যোতিকে অন্তরে আহ্বান করুক।

—অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, পি-এইচ-ডি,
কলিকাতা, ১৩ই জুলাই, ১৯৪১

বেদান্তের অনুপ্রেরণায় মানুষ কেমন ক'রে দেবত্বলাভ করতে পারে ও তাঁর জীবন নিজপরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়ে কেমন করে সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্বহিতে সে আপনাকে নিবেদন করে, তাই আমরা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ অভেদানন্দ মহারাজের জীবনে দেখতে পাই। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও সুদূরপ্রসারী কর্ম্মশক্তি আমাদের জীবনে নবশক্তির সঞ্চার করবে। এরূপ আদর্শজীবনের যথাযথ বিবরণ পুস্তাকাকারে লিপিবদ্ধ করলে তোমরা যে সুধীজনমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এম-এ, পি-এইচ-ডি,
কলিকাতা, ১২ই জুলাই, ১৯৪১

ভারতের যে সকল কৃতী সন্তান কেবল স্বদেশেই নহে, পরন্তু সমগ্র জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রধান দান বেদান্তবাদ প্রচার করিয়া মরুচারী মানবকে স্নিগ্ধ অমৃতধারার সন্ধান দিয়াছেন—স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদিগের দলস্থ। তাঁহার জীবন-কথা যত আলোচিত হয়, ততই জাতির ও জগতের মঙ্গল। সেইজন্য আমি তাঁহার কথার আলোচনা-চেষ্টায় প্রীত হইয়া সে চেষ্টায় আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
'বসুমতী'-সম্পাদক, কলিকাতা,
১৮ই জুন, ১৯৪১

সমসাময়িক ভারতবর্ষের চিত্তকে অধ্যাত্ম-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করবার সাধনায় যাঁরা ব্রতী ছিলেন, যাঁদের দুর্জ্জয় তপস্যা এই জড়বাদের যুগে মানুষের প্রাণে জাগিয়েছে আত্মাকে জানবার পিপাসা, বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণী প্রচার ক'রে যাঁরা সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজেকে সকলের মধ্যে দেখবার দুর্লভ দৃষ্টি দিয়েছেন—তাঁদের জীবন ও বাণীকে সকলের মধ্যে নিয়ে যাবার এই যে উদ্যম দেখ্‌ছি আমার তরুণ বন্ধুদের মনে এতে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। গোড়ামি কেবল ধর্ম্মের মুখোস প'রে আসে না, বিজ্ঞানের মুখোস প'রেও সে দেখা দেয়। আজকের দিনে ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা আর নাস্তিক্যবাদের প্রাদুর্ভাবের মূলে রয়েছে যুক্তিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেবার দৃষ্টিহীনতা। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিচ্ছেদ ঘটাবার কোনো কারণ নেই। এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। এই সমন্বয় করবার শক্তির উপরেই আমাদের কল্যাণ নির্ভর করে। বিধাতা আমাদের এই তরুণ বন্ধুগণের উদ্দেশ্য সফল করুন। আমাদের জাতির তারুণ্য বিজ্ঞানকে স্বীকার করতে গিয়ে অধ্যাত্মসত্যকে যেন অস্বীকার না করে, নূতনকে গ্রহণ করতে গিয়ে অতীতকে যেন নির্ব্বিচারে জলাঞ্জলি না দেয়, শক্তির চর্চ্চা করতে গিয়ে সর্ব্বজনীন কল্যাণকে যেন বিস্মৃত না হয়, সৌন্দর্য্যের পূজারী হ'তে গিয়ে বাস্তবের দাবীকে যেন উপেক্ষার চোখে না দেখে। অর্থনৈতিক গণ-তন্ত্রের দাবীকেতো মেনে নিতেই হবে—কারণ 'খালিপেটে ধর্ম্ম হয় না—কিন্তু সেই দাবীকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যুগযুগান্তের অধ্যাত্মসাধনাকেও যেন স্বীকার করতে পারি। মাটিকে স্বীকার করতে গিয়ে যেন আকাশকে না ভুলি, আকাশকে স্বীকার করতে গিয়ে মাটিকে যেন বিস্মৃত না হই।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২রা জুলাই, ১৯৪১

স্বামী অভেদানন্দজীর ত্যাগ-পূত জীবন কর্ম্মসাধনায় সমুজ্জ্বল। এইরূপ মহনীয় জীবনের অনুশীলনের দ্বারা আমাদের আশা-স্থল ছাত্রবৃন্দ নিজেদের জীবন গঠন করিলে ভবিষ্যতে ভারতভূমির সুসন্তানরূপে জগতে বরণীয় হইবেন, এরূপ আশা দুরাশা নহে। স্নেহভাজন ছাত্রবৃন্দের এই বিষয়ে অভিনিবেশ লক্ষ্য করিয়া হৃদয়ে বস্তুতঃই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি।

— অধ্যাপক শ্রীহারাণ চন্দ্র শাস্ত্রী

কলিকাতা, ২৯শে জুলাই, ১৯৪১

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী রচনায় শ্রীমান হরিদাস মুখোপাধ্যায় ব্রতী হইয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিদেশে বেদান্তপ্রচার একসময়ে বাংলাদেশের গবের বিষয় ছিল। এখনকার তরুণসমাজে হয়তো তাহার স্মৃতিটুকুও অবশিষ্ট নাই। শ্রীমান কিশোরদের নিকটে স্বামীজির জীবনকথা পরিবেশনের ভার লইয়াছেন। তাহার এই কার্গের আমি সফলতা কামনা করি। শুভ সঙ্কল্প, সাধনাও শুভোদর্ক হউক।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর-এস্

কলিকাতা, ১২ই জুলাই, ১৯৪১

বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও দর্শনের স্বরূপ ভারতের বাহিরে প্রচার করিবার শুভ উদ্দেশ্যে যাঁহারা দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছেন ও বিদেশে স্বদেশের গৌরবময় অতীতের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিশ্ববরেণ্য মনীষী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনানুপ্রাণিত কর্ম্মযোগী বীরসন্ন্যাসী স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রমুখ তাঁহার সহকর্ম্মী পুণ্যশ্লোক গুরুভ্রাতৃগণের নাম তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। আপনারা অভেদানন্দজী মহারাজের এই নবীন উদ্যমের কাহিনী প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা কল্যাণকরী সাহিত্যসেবা

বর্ত্তমানযুগে আর সম্ভব হইতে পারে না। আপনাদিগের শুভ সঙ্কল্প সার্থক হউক—শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

"অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।"

অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী
এম-এ, পি-আর-এস, বেদান্ততীর্থ,
কলিকাতা, ২৩শে জুন, ১৯৪১

স্বামী অভেদানন্দ কেবল একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহার স্থান কত উচ্চে। তাঁহার গ্রন্থাবলী অমূল্য জ্ঞানের আকর। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মশক্তির আলোচনা আমাদের ছাত্রসমাজকে অবশ্যই আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত করিবে।

—অধ্যাপক অধরচন্দ্র দাস, এম-এ, পি-আর-এস্,
পি, এইচ্, ডি,
কলিকাতা, ২৯শে জুন, ১৯৪১

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। বাল্যকালেই তাঁর অপূর্ব্ব ত্যাগবৈরাগ্যের জীবন, তাঁর অসীম জ্ঞানস্পৃহা, তাঁর যোগীস্বভাব স্ফূর্ত্তি পেয়েছিল এই সংসার কোলাহলের ভিতরে। শাস্ত্রে বা দর্শনে যে শ্রেষ্ঠজ্ঞানের ইঙ্গিত আছে, তাকে তিনি উপলব্ধির দ্বারা তাঁর তপস্যাপূত সাধনায় বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেছেন। এইরকম অদ্ভুদ্ ত্যাগবৈরাগ্য ও ধ্যানগম্ভীর ভাবময় জীবন সর্ব্বকালেই সর্ব্বদেশে ভক্তির অর্ঘ্য পাবে—এ আর আশ্চর্য্য কি!

—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন
[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব্ব গিরিশ-লেক্চারার]
কলিকাতা, ১২ই জুলাই, ১৯৪১

ভূমিকা

আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল বিশ্রুতকীর্ত্তি স্বামী অভেদানন্দ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের ধ্যানগম্ভীর অথচ কর্ম্মবহুল বিচিত্র জীবনের সামান্য কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়াস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে করা হইয়াছে। ইঁহার লেখক স্বামীজীর উৎসাহী ভক্ত। ইনি সুগভীর শ্রদ্ধা ও জ্বলন্ত উদ্দীপনার সহিত স্বামীজীর জীবনকাহিনীর নানা দিক্ সুললিত ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যুগসন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হইয়া যে মহাপুরুষ সমগ্র মানবসমাজের নিকট ধর্ম্মসমন্বয়ের অপূর্ব্ব বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই পরমহংসদেবের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। **স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ যে একাদশটি শিষ্যের উপর পরমহংসদেব তাঁহার বাণী বিশ্বময় প্রচার করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই একাদশটি বীর সন্ন্যাসী, কর্ম্মী ও প্রচারকদের মধ্যে স্বামীজী ছিলেন একজন অতি-প্রধান। বিশেষতঃ বিদেশে পাশ্চাত্যজগতে ভারতীয় বেদান্তের বাণী বহন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অভেদানন্দ মহারাজকেই তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে এই প্রচার ব্যাপারে সমুদয় ভারই তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।** স্বামী অভেদানন্দজীর সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর ব্যাপী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রবাসজীবন এবং তত্রত্য কার্য্যকলাপই তাঁহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জীবনের সায়াহ্নে উপযুক্ত কর্ম্মীর উপরে

পাশ্চাত্যের কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া স্বামীজী মহারাজ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ; এবং তৎপর অদম্য উৎসাহে নানাস্থানে আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আমরণ তাঁহার জীবনব্রত বেদান্তের বাণী প্রচারলিপ্ত থাকেন। পরিণত বয়সে জীবনের ব্রত সমাধা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ সাধনোচিত ধামে প্রযাণ করেন।

স্বামীজী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু দেশবাসিগণের নিকট রহিয়া গিয়াছে পূত উৎসর্গীকৃত ভাস্বর জীবনের একটা মহীয়ান্ আদর্শ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে সেই মহীযান আদর্শের সেই ভাস্বর জীবনের সামান্য একটি আলেখ্যমাত্র অঙ্কিত হইয়াছে। **বাঙ্গালার গৃহে গৃহে এই আলেখ্যখানির প্রচার হউক, এবং স্বামীজী মহারাজের জ্যোতির্ম্ময় জীবনের দীপ্তি বঙ্গীয় যুবসমাজকে আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ করুক —ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।** ইতি—

১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৮
কলিকাতা।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

নবযুগের মানুষ

প্রথম অধ্যায়

জন্ম, বাল্যশিক্ষা ও গুরুসন্ধান

"Spiritual geniuses possess the highest that man can possess, constant contact with the creative principle of which life is the manifestation, coincidence with the divine will, serene calm, inward peace which no passion can disturb, no persecution can dismay"

—Sir S. Radhakrishnan

[Contemporary Indian Philosophy.]

নিজেকে জানার প্রশ্নই হলো মানব জীবনের সব থেকে বড় প্রশ্ন।* এই অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের মধ্যেই মানবজীবনের পূর্ণতা ও শাশ্বতী শান্তি। সুদূর অতীতে ভারতীয় ঋষিবৃন্দ তপোবনের তরুতল থেকে উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের আকাশতলে উচ্চারণ

* Man's greatest achievement is to understand the mysteries of his own being—to know himself.

—Spiritual Unfoldment—P. 44

করেছেন,—"আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জান। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের দার্শনিকগণও আত্মজ্ঞানলাভকেই জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলে মনে করতেন। সমগ্র গ্রীক জগতের মধ্যে পুণ্যে ও মাহাত্ম্যে ডেলফির ধর্ম্মমন্দিরই ছিল সর্ব্বপ্রধান। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে বড় বড় অক্ষরে ক্ষোদিত ছিল 'Know thyself' অর্থাৎ নিজেকে জান।

জগতের বিচিত্র বিভাগ থেকে সুপ্রচুর জ্ঞানলাভ সত্ত্বেও মানুষ যদি নিজের প্রকৃত স্বরূপ না জানতে পারে, তার জ্ঞান অপূর্ণই থেকে যায়। শত শত বৎসর ধরে অবিশ্রান্তভাবে জ্ঞানের সাধনা করেও মানুষের জ্ঞানান্বেষণ সমাপ্ত হয় না—উপরন্তু সে ক্রমশঃই বুঝতে পারে যে, যতটুকু সে জেনেছে অজানার তুলনায় তা নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। সঞ্চিত জ্ঞানের বাতায়ন-পথে সে যখন বিশাল বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে দেখে তার সম্মুখে বিস্তীর্ণ রয়েছে অজানার অন্তহীন মহাপ্রান্তর। বিপুল বিস্ময়ে সে তখন বলে উঠে,—

"Yet all experience is an arch, wherethro'
Gleams that untravell'd world, whose margin fades
For ever and for ever when I move."

শত শত বৎসর ধরে জ্ঞানের তীর্থপথে চলেও মানুষের যদি হয় এই পরিণতি, তবে এক জীবনে জ্ঞানের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করা তার পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব। এইজন্যই ঋষিরা বহির্জগত

থেকে কখনও জ্ঞানের পূর্ণতালাভের চেষ্টা করেন নি—তাঁরা নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন অন্তর্জগতের অতুলনীয় সাধনায়। জীবনের সকল সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের সত্যিকারের উৎস নিজেদের ভিতরেই নিহিত—বাইরে কেবল তারই অভিব্যক্তি। এই জ্ঞানে জ্ঞানবান যাঁরা—জগতে তাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষরূপে পূজিত হয়ে থাকেন।

দেশ, কাল ও নিমিত্তের পরপারে নিহিত যে অখণ্ড ও অব্যয় সত্য—তারই বার্ত্তা তাঁরা বহন করে আনেন বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে। তাঁদের বাণী চিরকাল ধরে বেঁচে থাকে মানব মনে, ছবিতে, শিল্পে ও গানে। তাঁরা নির্দ্দিষ্ট কোন দেশে ও কালে জন্মগ্রহণ করেও চিরদিনই দেশকালের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরা কোন দেশের বা যুগের মানুষ নন, তারা 'Eternal Beings'—চিরকালের মানুষ। গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও অহমিকার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা কোনদিনই তাঁদের বিশাল প্রতিভাকে ধরা দেন না। সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও উদারতা প্রভৃতি মহৎ গুণের তাঁরা মূর্ত্ত প্রতীক। দৈন্য তাঁদের শির নত করতে পারে না, তাঁদের অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিকট দৈন্যও পরাজয় স্বীকার করে। তাঁরা মানুষের কানে চিরন্তনের বাণী শুনান, ক্ষুদ্র প্রাণহীন আচারের বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দেন—তাকে আলো আর প্রেমেভরা জগতে তুলে ধরেন, তাকে সত্যিকারের মানুষ হবার পথ দেখান। তাঁদের প্রসব করে জগৎ ও জাতি ধন্য হয়। এই রকমেরই একজন সত্যদ্রষ্টা মহামানবের

জীবনচরিত এই গ্রন্থে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। বর্ত্তমান ভারতে যে একটা নূতন জীবন আন্দোলিত হচ্ছে—তিনি ছিলেন তার একজন অতি-প্রধান স্রষ্টা। প্রাচীনকালে ঋষিদের মতই তিনি ছিলেন সহজ ও সরল, জ্ঞানে ও পুণ্যে মহীয়ান্, প্রেমে ও কর্ম্মে সুন্দর। আজ শুধু ভারতবর্ষেই নয়—সাগরপারের নানা দেশেও আজ তাঁর নামে উঠছে বিপুল জয়ধ্বনি। তিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর এই মহামানব কলিকাতার উত্তরপ্রান্তস্থ আহিরীটোলার এক সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক জন্মের সময়েই তাঁর লক্ষণাদি দেখে লোকেরা ধারণা করেছিল যে ইনি নিশ্চয়ই যোগীপুরুষ। তাঁর মাতা নয়নতারা দেবী যোগীসন্তান লাভের জন্য বহুদিন কালীমাতার আরাধনা করে-ছিলেন। তার ফলেই এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কালীমাতার প্রসাদে এই পুত্র লাভ করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখলেন কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের মাতা ও পিতা উভয়েই সাধারণ মাতাপিতা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উন্নত ছিলেন। সুযোগ্য পুত্রলাভের মানসে নয়নতারা দেবীর যে অত্যুগ্র তপস্যা তা কৌশল্যার কথাই বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। রামায়ণে পড়েছি যে কৌশল্যা সুপুত্রলাভের জন্য অতি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তার ফলেই তিনি লাভ করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মতো মহামানবকে। জগতে সব কিছুই মানুষকে সাধনার দ্বারা দুঃখের মধ্য দিয়ে লাভ করতে হয়। সুসন্তান

লাভের আশায় আধুনিক যুগেও চন্দ্রমণি দেবীর সাধনা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা), ভুবনেশ্বরীর তপস্যা (বিবেকানন্দের মাতা) ও নয়নতারা দেবীর আরাধনা আমাদের সকলকেই স্তম্ভিত ও শ্রদ্ধাবনত করে দেয়। অভেদানন্দের মত ঋষি-সন্তান নয়নতারা দেবী জগতকে উপহার দিয়েছেন—এটাই তাঁর সব থেকে বড় পরিচয়। যে কারণে আমরা কৌশল্যাকে শ্রদ্ধা করি, মেরীকে সম্মান দেখাই, চন্দ্রমণি দেবী ও ভুবনেশ্বরীকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি—ঠিক সেই কারণেই নয়নতারা দেবীও আমাদের নমস্য ও বরণীয়।

কালীপ্রসাদের পিতা রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর—ইংরাজী ভাষার একজন বিশিষ্ট শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষকের যে সকল গুণ থাকা দরকার—সবগুলিরই মহান্ বিকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। বিগত শতাব্দীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁর ছাত্র ছিলেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস পাল, বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত হাস্যরসিক অমৃতলাল বসু, মাননীয় বিশ্বনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পিতা) প্রভৃতি অনেকেই তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। সাধারণ শিক্ষক অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ছিলেন বলেই—রসিকবাবু বিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষকতা করেই তৃপ্ত থাক্‌তে পারেন নি। ধর্ম্মের দিকেও তাঁর ছিল অসামান্য অনুরাগ—তাই আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির জন্যও তাঁর সাধনা ছিল বিরামবিহীন।

এই রকমেরই একটী বিশিষ্ট সদ্বংশে জন্মেছিলেন কালীপ্রসাদ। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁর বিদ্যাশিক্ষার পালা সুরু হয় ও লাহাপাড়ায় গোবিন্দশীলের পাঠশালায় তাঁকে ভর্ত্তি করান হয়। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর যদুপণ্ডিতের বিদ্যালয়ে তিনি প্রবেশলাভ করেন ও সেখানে প্রায় তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। লেখাপড়ায় তিনি সর্ব্বস্থানেই অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতেন। বিদ্যালয়ে কোন বালকই এজন্য তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠ্‌ত না। যদুপণ্ডিতের বিদ্যালয়েই বাবুরাম ঘোষ কালীপ্রসাদের বিশিষ্ট সহপাঠী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই বাবুরাম ঘোষই রামকৃষ্ণসঙ্ঘে স্বামী প্রেমানন্দ নামে সুপরিচিত হ'য়েছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে কালীপ্রসাদ শুধু লেখাপড়াতেই নয়, খেলাধূলাতেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতেন। অন্যদিকে আবার ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মভাবও তাঁর মধ্যে ছিল জ্বলন্ত। মাতার মুখে তিনি প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী শ্রবণ করতে করতে নব নব ভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। তাঁর পিতামাতা সুযোগ ও সুবিধা মত বালক কালীপ্রসাদের অন্তরে ধর্ম্মের বিপুল প্রেরণা জাগিয়ে দিতেন। যে বালক ভবিষ্যতে জগতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে উঠবেন, তাঁর মহান্ জীবনের সূত্রপাত এ ভাবেই হয়েছিল।

যদুপণ্ডিতের বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে কালীপ্রসাদ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি প্রতি বৎসরই Double promotion লাভ করতেন। বিদ্যালয়ের

সংস্পর্শে জড়িত সকল শিক্ষক ও ছাত্রই তাঁর চিত্তের একাগ্রতা, অধ্যয়নস্পৃহা ও প্রতিভায় বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সময় তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ছন্দোমঞ্জরী ও সংস্কৃত সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠকাব্য অধ্যয়ন করেন। চিত্রাঙ্কণে এই সময় তিনি অতি-নিপুণ হয়ে উঠেন ও সকলকে অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করে বিমোহিত করেন। Wilson's History of India পাঠ করতে করতে তিনি যখন জানতে পারলেন যে শঙ্করাচার্য্য ভারতের একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক—তখন থেকে তাঁর মনে দার্শনিক হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো! তিনি ক্রমশঃই বুঝতে পারলেন যে চিত্রকর অপেক্ষা দার্শনিক বেশী বড়। তখন তিনি চিত্রাঙ্কণ ছেড়ে দিয়ে দার্শনিক হবার দিকে ঝুকে পড়লেন। এই ভাবেই তাঁর জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হলো।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মপিপাসা ও জ্ঞানান্বেষণ ক্রমশঃই বেড়ে চললো। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তই ছিল তাঁর কাছে অনুপম। প্রতিটি মুহূর্ত্তকে যাঁরা সদ্ব্যবহার করতে পারেন জগতে তাঁরাই বড় হন। মানব-ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে জীবনে বড় হবার মহামন্ত্রই হচ্ছে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রতিভা। ধনী বা দরিদ্রের গৃহে জন্মালেই বড় বা ছোট হয় না; প্রতিভা ও মনঃসংযম ও উদ্যম যদি থাকে তবেই মানুষ জীবনে জয়যুক্ত হতে পারে। এই রকমেরই একাগ্রতা ও প্রতিভা, শক্তি ও সাহস নিয়ে জন্মেছিলেন কালীপ্রসাদ। তাই আঠার বৎসর বয়সে তাঁকে আমরা যে মূর্ত্তিতে পাই, তা অসামান্য

প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। এই সময়ে তিনি John Stuart Mill-এর Logic, Three Essays on Religion, Herschel's Astronomy, Ganot's Physics, Lewis's History of Philosphy, Hamilton's Philosophy প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি টীকাসহ আয়ত্ত করেন। এই সময় সংস্কৃত ভাষায় ও ছন্দে তাঁর এমন অধিকার জন্মেছিল যে তিনি সংস্কৃতে সুন্দর সুন্দর কবিতাও রচনা করতে পারতেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়নকালে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এ যুবা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একজন বিরাট মানুষ হয়ে উঠ্‌বেন। রসিকবাবু তাঁর পুত্রের অসাধারণ আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসুতা লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন—"এরূপ inquisitive ছেলে আর দেখি নি।" যাই হোক আঠার বৎসর বয়সে কালীপ্রসাদ এই বিদ্যালয় থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

এই সময় নানা ধর্ম্মস্রোত বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। একদিকে রেভারেণ্ড ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড, রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি খ্রীষ্টান-মিশনারী খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন করেছিলেন। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম পুনর্জীবিত করবার মানসে এই সময়ই আবার বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিত শশধর

তর্কচূড়ামণি ও বাগ্মী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। সকল প্রকারের ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই কিশোর কালীপ্রসাদ যোগদান করতেন। হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতাগুলি সারা বাঙ্‌লা দেশকে মুখরিত করে তুলেছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই পণ্ডিতপ্রবর এলবার্টহলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় হিন্দু ষড়দর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন।* এই বক্তৃতাগুলি কিশোর কালীপ্রসাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতাগুলি এতই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে দর্শন অধ্যয়নের একটা বিপুল আগ্রহ এ সময় আরও প্রবলভাবে কালীপ্রসাদের মনে জেগে উঠে। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই যোগসাধনার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মধ্যে জাগ্রত হওয়ায় কিশোর কালীপ্রসাদ এখন বিখ্যাত দার্শনিক কালিবর বেদান্তবাগীশের কাছে পতঞ্জলির দর্শন অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এই পাতঞ্জল দর্শন অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভা-বান কালীপ্রসাদ সমাপ্ত করেন। এখন তিনি আত্মবিশ্লেষণ ও নিজেকে বারবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যোগশাস্ত্রে বর্ণিত উপায় অনুসরণ করে নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ। কিছুদিন চেষ্টাও করলেন—কিন্তু সফল হলেন না—মনেও তৃপ্তি পেলেন না। এমনি করে কিছুদিন কেটে গেল। কালীপ্রসাদের মনে যোগী হবার আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠতে

* Contemporary Indian Philosophy—Edited by S Radha-krishnan and J. H. Muirhead—P 48.

লাগলো। অবশেষে তিনি একদিন শুনলেন যে উপযুক্ত যোগী গুরু ভিন্ন যোগশিক্ষা কখনো সম্ভব নয়। এই কথা শোনার পর কালীপ্রসাদ নিজে যোগশাস্ত্রে বর্ণিত উপায়ে যোগশিক্ষার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে যোগীগুরুর সন্ধানে রত হলেন।

সত্যান্বেষী কালীপ্রসাদ ব্যাকুল হয়ে সদ্‌গুরুলাভের জন্য স্থানে স্থানে যাতায়াত করতে লাগলেন। বহু বক্তার বক্তৃতা শুনলেন—কিন্তু তাঁর মন তাতে তৃপ্ত হতে পারে নি। ভগবান কে —আত্মার স্বরূপ কী—এই সকল প্রশ্ন মানুষের মনে যখন জাগে, তখন সে আর সংসারের ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ ও সন্তোষ তখন তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে রয়েছে অসীমপুরুষের স্পর্শ ও অজানার আকর্ষণ। এই অজানা ও অসীমকে লাভ করবার সাধনা একমাত্র মানুষের মধ্যেই স্থান পেয়েছে। অসীমের যে আহ্বান তা যখন মানুষের কানে এসে পৌঁছায়, তখন সে ঘরের মায়া পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে পথের বুকে। কানন কান্তার হিমাদ্রি লঙ্ঘন করে আদর্শের পানে চলেছে যুগে যুগে মানুষের বিপুল অভিযান। দুঃখ এসেছে বারে বারে তার করাল মূর্ত্তি নিয়ে—কিন্তু তীর্থ-যাত্রী মানব বারে বারেই দুঃখকে পরাজিত করেছে। ঝড়ঝঞ্ঝা ও ফেনিল সমুদ্রকে সে অগ্রাহ্য করেছে— মৃত্যুভয়ের সামনেও বার বার বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তবুও সে ছাড়ে না তার সাধনা। কালীপ্রসাদের মনেও এইরূপ একটা সর্ববনেশে প্রশ্ন জেগেছিল। যোগসাধনা করে নির্বিকল্প

সমাধিলাভ করবো—এই আকাঙ্ক্ষা কালীর মনে প্রবলতম হয়ে উঠেছে! যোগসাধনার জন্য উপযুক্ত গুরু চাই। তাঁর সন্ধানে তিনি এতই বিভোর হয়ে গেলেন যে আহারনিদ্রার দিকেও আর লক্ষ্য রইলো না। গুরুর সন্ধানে তিনি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। এইভাবে কিছুদিন কেটে গেলো। অবশেষে একদিন তিনি তাঁর সহপাঠী ও সোদর প্রতিম বন্ধু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যকে তাঁর মনের কথা জানালেন। তাঁর বন্ধু তখন তাঁকে বললেন,—"হাঁ, দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির কালী বাড়ীতে এক অদ্ভুত যোগী পরমহংস থাকেন, তাঁর নিকট গেলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হতে পারে।" এই কথায় কালীর মনে আনন্দ ও ব্যাকুলতা দ্বিগুণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

দিনের পর দিন চলে যায়—কিন্তু নানা অসুবিধাবশতঃ আর দক্ষিণশ্বরে যাওয়া হয় না। কালীপ্রসাদের মনেও ব্যাকুলতা দিনে দিনে নবীন হয়ে জাগতে লাগলো। তারপর একদিন স্থির সঙ্কল্প হয়ে দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। কত আশা ও ব্যাকুলতায় ভরা ছিল তাঁর চিত্ত। দীর্ঘপথ অতিক্রম সেদিন কালী যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই করে ফেললেন। কিন্তু যখন তিনি দক্ষিণশ্বরে উপস্থিত হয়ে শুনলেন যে, পরমহংসদেব সে সময় কলিকাতায় কোন ভক্তের বাড়ীতে গেছেন, তখন তাঁর কিশোর ও কোমল চিত্ত গভীর বেদনায় গুমরে গুমরে কেঁদে উঠলো। যা বড় ও মহান তার প্রতি মানুষের কেমন যেন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

তাই বড়কে ও বৃহৎকে লাভ করতে না পারলে মানুষের মনে স্বভাবতঃই যে বেদনার সঞ্চার হয়, সেটা অবশ্য খুবই গৌরবের। কালীপ্রসাদের এই যে নিগূঢ় অন্তর্বেদনা তাও ছিল ঠিক সেই রকমেরই। সময় কেটে যেতে লাগলো। একধারে তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর, আবার অন্যদিকে সূর্য্যের প্রচণ্ডোত্তাপ ও মনে উদাস ব্যাকুলতা। এমন সময় পরমহংসদেবের একজন যুবকভক্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হলো। সেই যুবক-ভক্তটি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর অনুরোধে কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরেই সেদিন স্নান ও আহার করলেন। এই যুবকটিই আমাদের শশী মহারাজ—যিনি ভাবীকালে রামকৃষ্ণানন্দ নামে রামকৃষ্ণজগতে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে নানাবিষয় আলোচনা করে কালীপ্রসাদ সারাদিন কাটালেন। ধীরে ধীরে দিবসের ক্লান্তরবি পশ্চিম গগনে ঢলে পড়লো। তারপর নদীর সারা বুকটা অস্তমিত রবির শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠলো। একদিকে সিন্ধুগামী ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ ও অন্যদিকে ছন্দোময় অধীর সমীরের স্পর্শ সেদিন কালীপ্রসাদের মনে যেন অসীমেরই গোপন বার্ত্তা বহন করে আনলো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার চারিদিকে ঘনিয়ে এলো। সন্ধ্যার পর রাত্রিও জগতের সর্ব্বত্র কালো আঁধার ছড়াতে ছড়াতে এসে উপস্থিত হলো। সময় যেন আর কাটেনা—এক একটী মুহূর্ত্ত সেদিন কালীপ্রসাদের কাছে এক একটী বৎসরের মতোই দীর্ঘ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। মহাসাগরের সঙ্গে মিলনের পূর্ব্বে গিরি-

উৎসারিত মহানদীর যে আবেগ জন্মে—কালীপ্রসাদের মনেও আজ ঠিক সেই রকমেরই একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগ ও ব্যাকুলতা! বৃক্ষের পাতাটি পড়লে, বায়ু জোরে প্রবাহিত হলে বা দরজায় সামান্যতম আঘাত হলেও কালীপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন এই বুঝি এলো তাঁর আরাধ্য দেবতা; এমনি করে সময় কেটে যেতে লাগলো। অবশেষে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ফিরে এলেন। কালীপ্রসাদের কথা তাঁকে শীঘ্রই জানানো হলো। কালীপ্রসাদ তারপর ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে ঠাকুরের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। সামান্য কথোপকথনের পরই তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আমি যোগ শিক্ষা করতে চাই। আপনি আমায় শেখাবেন কি?" কালীর এই প্রশ্নে ঠাকুর অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন,—তুই পূর্ব্বজন্মে একজন খুব বড় যোগী ছিলি; সিদ্ধিলাভ করবার একটু বাকী ছিল—এই তোর শেষ জন্ম—আয় তোকে যোগ সাধনের উপায় শিখিয়ে দেই।"* এই এক কথাতেই তিনি কালীর অন্তর জয় করে ফেললেন। তারপর মহামানবতার জীবন্ত মূর্ত্তি রামকৃষ্ণদেব কালীকে যোগাসনে বসিয়ে তাঁর জিহ্বায় স্বীয় অঙ্গুলির দ্বারা মূলমন্ত্র লিখে দিলেন এবং কালীর বুকে নিজের দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করলেন। এই স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই

* See Abhedananda's "Biographical"—Page 48

Contemporary Indian Philosophy—edited by S. Radhakrishnan and J. H. Muirhead.

আজন্মযোগী কালীপ্রসাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যুদ্বেগে সুষুম্নার পথ বেয়ে ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হলো এবং কালী গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। "The mystic touch of the Master brought about a wonderful revolution in his mind, and he immediately became buried in deep meditation" [Prabuddha Bharat, Oct, 1939] কালীর তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না—তিনি কাষ্ঠবৎ নিশ্চল ও স্থির হয়ে রইলেন। রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে তিনি দেখলেন সমস্ত দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শের জীবন্ত প্রকাশ। প্রকৃতই শ্রীশ্রীঠাকুর এই জড়-বাদের যুগে ছিলেন অপরিণামী অব্যয় সত্যের মূর্ত্ত প্রতীক। Contemporary Indian Philosophy-তে তাই দেখি (স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন), "In him I found the embodiment of the Absolute Truth of the highest philosophy, as well as the Universal Religion which underlies all sectarian religions of the world". এইভাবে সমাধিমগ্ন হয়ে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর পরমহংসদেব পুনরায় কালীর বুকস্পর্শ করেন এবং কালীকে গভীর সমাধি (the state of superconsciousness) থেকে উত্থিত করেন। তারপর যোগসাধনার নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করে কালীকে বল্লেন,—

"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি
তুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।"

এইভাবে কালী সেদিন অভেদজ্ঞানের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। পরবর্ত্তী কালেও আমরা দেখতে পাবো যে কালী এই অভেদ-জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন এবং পরিশেষে ঐ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অভেদানন্দ নামে পরিচিত হয়েছেন।

কালীপ্রসাদের যোগ-সাধনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরমহংসদেবের নির্দ্দেশমত আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা নরেন, রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন

রামকৃষ্ণদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সময় থেকে (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) কালীপ্রসাদের জীবনে এক অভিনব অধ্যায়ের সৃষ্টি হলো। কালীপ্রসাদ এখন ঘন ঘন পরমহংসদেবের কাছে 'যাতায়াত করতে লাগলেন। দিন দিনই তাঁর বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তি প্রবলতর হয়ে উঠলো। সুযোগ পেলেই তিনি ঘরের রুদ্ধ আবহাওয়া পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতেন মুক্ত মহাকাশের তলে—যেথায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শনিশান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন করুণাময় ঠাকুর। রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত বাণীর মধ্যে কালীপ্রসাদ খুঁজে পেলেন অমৃতের সন্ধান। যে একবার এই ভক্তি-পাগল ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছে, সে আর তাঁকে ছাড়তে পারে নি—এমনি ছিল ঠাকুরের বিরাট আকর্ষণী

শক্তি। তাঁর কাছে দার্শনিক এলো, কবি এলো, যুক্তিবাদী এলো, মুক্তিকামী এলো, আরো এলো অনেকেই। কত গিরিশচন্দ্র, কত কেশব সেন তার পুণ্য সংস্পর্শে এসে হয়ে গেছে একেবারে ভিন্ন মানুষ। ঐশী শক্তির একেবারে জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন বলেই তাঁর একটী স্পর্শেই মানুষের জীবনে এসে যেতো যুগান্তর। তিনি সর্ব্ববিভূতিকে হজম করেছিলেন—বাইরে কখনো তা তিনি প্রকাশ করতেন না এবং শিষ্যদেরও সর্ব্বদাই বিভূতিপ্রকাশ করতে নিষেধ করতেন। "But one power which we have seen Him frequently to exercise was the Divine power to transform the character of a sinner and to lift a worldly soul to the plane of superconsciousness by a single touch. He would take the sins of others upon His own shoulders and would purify them by transmitting His own spirituality and by opening the spiritual eyes of His true followers".*

কালীপ্রসাদ দীক্ষাগ্রহণের পর থেকেই ঠাকুরের একান্ত প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন। ঠাকুরের অন্যান্য যুবক ভক্তের ন্যায় তিনিও সুযোগমত ঠাকুরের কাছে আসতেন ধর্ম্মের অমৃতরস পান করে পরম আনন্দ ও তৃপ্তি পেতে—"His thirsty soul drank deep at the perennial fount

* The Religions of the world—vol I. Page 122.

of heavenly wisdom which issued from the lips of the Master for the spiritual comfort of eager aspirants—[Prabuddha Bharat, oct, 1939]. "তুই না এলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।" যাই হোক, ঠাকুরের নির্দ্দেশে কালী আধ্যাত্মিক পথে দিন দিনই অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর ধ্যান জপও প্রগাঢ়তর হয়ে উঠলো। সাধারণতঃ আমরা 'ধ্যান' বলতে যা বুঝি আসলে কিন্তু সেটার নাম 'প্রত্যাহার' withdrawal of the mind from the objects of the senses) ; এখানে অবশ্য 'ধ্যান' শব্দটি প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ধ্যানের মানে হচ্ছে, "continuous or unbroken flow of one current of thought towards a fixed ideal."* কালীপ্রসাদ এই সময় ধ্যান করতে করতে শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করতেন ও নব নব আধ্যাত্মিক তত্ত্বও উপলব্ধি করতেন। এইসব বিষয় তিনি ধ্যান হতে উঠার পর ঠাকুরকে সবিস্তারে জানাতেন। একদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তিনি দর্শন করলেন "দিব্যাকাশে ঈশ্বরের অশরীরী সদা জাগ্রত সর্ব্বব্যাপী চক্ষু (Omnipresent eye of God)—যার সম্বন্ধে ঋষিরা বলেছেন,—"তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" আর একদিন তিনি দেখলেন সমস্ত দেবদেবী পরমহংসদেবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। ঠাকুরকে যখন তিনি এই বিষয় জানালেন, তখন ঠাকুর তাঁকে সস্নেহে

* Spiritual Unfoldment—Page 55.

বল্‌লেন,—"যা, তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেলো, তুই আর কোন মূর্ত্তি দেখতে পাবি না, এখন থেকে তুই অরূপের ঘরে উঠে গেলি।"

ইতঃপূর্ব্বেই নরেন, রাখাল, লাটু প্রভৃতি যুবক ভক্ত পরম-হংসদেবের নিকট যাতায়াত করতেন। কালীপ্রসাদের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের পরিচয় হয়ে গেলো এবং সেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ়তা লাভ করে শেষে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বে পরিণত হলো। বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কালীপ্রসাদের সম্বন্ধ একেবারে অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠলো। সর্ব্ববিষয়ে তিনি নরেন্দ্র-নাথকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন—যেমন লক্ষ্মণ করতেন শ্রীরামচন্দ্রকে। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের মধ্যে নিজের সত্তাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন—আত্মভোলা হয়ে রামচন্দ্রকে ভালবাসতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি কালীর আধ্যাত্মিক প্রেম ও ভক্তি ছিল ঠিক সে ধরণেরই। জগতের অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে এ দিব্য সম্বন্ধ ভাষায় মানুষ প্রকাশ করতে পারে না। কালী-প্রসাদ আহারে, বিহারে, অধ্যয়নে, শাস্ত্র-বিচারে, ধ্যান-ধারণায়, শয়নে, জাগরণে নরেন্দ্রনাথের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী হয়ে উঠ্‌লেন। এই জন্যই বোধ হয় পরবর্ত্তী যুগে আমরা দেখতে পাবো—এঁদের দু জনের মধ্যে একই রকমের প্রচণ্ড নির্ভীকতা, জ্ঞানের অতুলনীয়তা, আদর্শনিষ্ঠা ও মহাতেজস্বিতা। দুজনেই যোদ্ধাপ্রকৃতি, আবার দুজনেই বীর ও ধীর সন্ন্যাসী! *

* Weekly Municipal Gazette—16-9-39.

কালীপ্রসাদের মন অতি শৈশব হতেই ছিল জিজ্ঞাসু ও বিচারশীল। সত্যকে লাভ করবো এই ছিল তাঁর জীবনের সঙ্কল্প। অন্ধবিশ্বাস বা বিচারহীন আচার কোনদিনই তাঁর মধ্যে স্থান পায় নি। "From my childhood I wanted to know the cause of everything and used to ask questions about the 'Why' and 'How' of all events". * যুক্তি ও বিচারের পথ ধরে চলার আগ্রহ তাঁর মধ্যে সব সময়ই ছিল। রামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেও তিনি যুক্তি ও বিচারকে বর্জ্জন করেন নি। কালীপ্রসাদ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে নানা তর্ক বিচারাদি করতেন—শেষে প্রায় নাস্তিকের মতই হয়ে পড়লেন। পরমহংসদেব কালীর বিষয় অবগত হয়ে কালীকে একদিন নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস্?" কালী উত্তর করলেন—"না"।

পরমহংসদেব—তুই বেদ মানিস্?

কালী—না।

পরমহংসদেব—তুই শাস্ত্র মানিস্?

কালী—না।

পরমহংসদেব—তুই লোকাচার মানিস্?

কালী—না।

সর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে কালীর এই "না" শুনে পরমহংসদেব বল্‌লেন,—"অপর কাউকে বল্‌লে গালে চড় মারতো।" স্পষ্ট

* Contemporary Indian Philosophy—Page 48.

বাদী কালী তখনই উত্তরে বললেন,—"আপনিও মারুন। আমি অন্ধ-বিশ্বাস চাই না—যতদিন ঈশ্বর কি বুঝতে না পারছি, ততদিন কি করে মানবো? আমাকে জানিয়ে দিন—সব মানবো।" ঠাকুর তখন সস্নেহে বল্‌লেন,—"তুই সব জান্‌বি।" গুরুর উপর কালীর ভক্তি ছিল অনুপম ও অবিচলিত! গীতায় যে আছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—তা খুবই সত্য কথা। শ্রদ্ধাই হচ্ছে জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান। ঠাকুরের উপর নরেন, রাখাল, কালী প্রভৃতির শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়—যার প্রকাশ ভাষায় করতে কবি এবং সাহিত্যিকগণও অক্ষম। তাকে প্রকাশ করতে মানুষ চেষ্টার ক্রুটী করে নি—কিন্তু বারে বারেই তার ভাষা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে! ঠাকুরের প্রতি নরেন, কালী প্রভৃতির শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল বলেই তাঁরা জীবনে জয়ী হতে পেরেছিলেন! যাই হোক, কালীপ্রসাদ ঠাকুরের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও ঠাকুরের নির্দ্দেশানুযায়ী গভীরভাবে ধ্যান, জপ ও সাধনা করতে সুরু করলেন। তারপর একদিন পরমহংসদেবের নিকট তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করলেন। করুণাময় ঠাকুর সস্নেহে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বললেন,—"তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" অত্যুগ্রসাধনায় এবার কালী নিমজ্জিত হলেন। আহার, নিদ্রা ও জগৎকে তিনি ভুলে গেলেন। সত্যলাভের জন্য একদিন প্রহ্লাদ, যাজ্ঞবল্ক্য আর গৌতম সুকঠোর তপস্যা করেছিলেন—কালীর তপস্যাও হলো সেই রকমেরই। ক্রমে ক্রমেই তিনি আধ্যাত্মিক জগতের নব নব আলোকের সন্ধান পেতে লাগলেন। অবশেষে

কালী নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় জন্মমৃত্যুর রহস্য-ভেদ ও ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একাত্মতা ও অভিন্নতা (unity and identity) উপলব্ধি করলেন।* পরমহংসদেব কালীর এই উপলব্ধির কথা শুনে সানন্দে বললেন,—"উহাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান।" কালীর সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ এখন দূর হয়ে গেল—তাঁর চিত্ত জ্ঞানের পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ঠাকুরের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা করেন যে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ আসলে পরস্পর বিরোধী মোটেই নয়—পরন্তু এরা প্রত্যেকেই পরস্পরের সহায়ক। "From Sri Ramkrishna I learnt that 'Dwaita' or Dualistic philosophy, leads to the Visista-Advaita philosophy of Ramanuja in search after the Ultimate Truth of the universe, which is one and the absolute (Brahman) ; and that the search after Truth ends in the realisation of the oneness of the Jiva (individual soul), Jagat (world) and Isvara (God) in Brahman as taught in the Advaita philosophy of Vedanta ; and that they are the different steps in the path of the realisation of the absolute

* We cannot think of another higher state than that of God-consciousness, because in this state, the soul communes with Divinity aud is united with the Infinite source of love, wisdom, and intelligence—Spiritual Unfoldment—Page 70.

truth of Brahman" * এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কালীর জীবনে রূপান্তর এসে গেল--তিনি এখন অখণ্ড ও পূর্ণ প্রজ্ঞার দৃষ্টিলাভ করলেন। সংসারের প্রতি তাঁর আর মমতা বা আকর্ষণ নেই। একদিন পিতা রসিকবাবু এসে ঠাকুরকে বললেন,—কালীকে গৃহে ফিরে যেতে অনুমতি দিন। ঠাকুর তখন বল্লেন,—"তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গেই এসেছে ও আস্‌বে। তাকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে আর তোমার ছেলে নয়। সে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।" ঠাকুর তো আর পাগল ছিলেন না। তিনি সত্য ও সঠিকরূপে জানতেন বলেই কালীর পিতাকে একথা বলেছিলেন। কালীর আধ্যাত্মিকতা প্রমাণের জন্য অন্য কোন কিছুরই আবশ্যক হয় না। ঠাকুরের এই একটী কথাই যথেষ্ট।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেব তাঁর এগার জন সর্ব্বত্যাগী যুবক শিষ্যকে স্বহস্তে গৈরিক বসন দান করেন্। এই এগারজন শিষ্যের নাম যথাক্রমে নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), বুড়োগোপাল (স্বামী

* (1) Abhedananda's "Biographical"—Page 50.
Contemporary Indian Philosophy.
(2) Search After Truth—Path of Realization.

(অদ্বৈতানন্দ)। এই সময় ঠাকুর কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে বাস করতেন—কিছুদিন পূর্ব্ব হতেই তিনি গলায় ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। এই সময় যুবক ভক্তবৃন্দ মনেপ্রাণে ঠাকুরের সেবা করতেন। কালী এখানে অবস্থানকালে আহার নিদ্রা বিস্মৃত হয়ে দিবারাত্র ঠাকুরের সেবা করতে লাগলেন। তাঁর সেবাকার্য্যে নরেন্দ্রনাথ এতই প্রীত হয়েছিলেন যে তিনি বলতেন,—"Kali is the personal Attache' to His Holiness Sree Ramkrishna Paramhansa." এখানে অবস্থানকালে ঠাকুরের সেবাকার্য্য করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে সামান্য একটু সময় পেতেন তাও তিনি নিয়োজিত করতেন নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নে। বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রবিচারও মাঝে মাঝে করতেন। কালীর অসাধারণ রকমের অধ্যয়ন লিপ্সাতে ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে একদিন বলেছিলেন—"তুইতো ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি।" আর একদিন আশীর্ব্বাদ করে বলেন,—"ছেলেদের মধ্যে তুইই বুদ্ধিমান; নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেইরূপ তুই-ও পারবি।" ঠাকুরের এ বাণী ভবিষ্যতে সফল হয়েছিল। এইভাবে ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনে বিপুল প্রেরণা দিয়ে দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। বর্ত্তমান জগতের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু তিনি এ ভাবেই দেহত্যাগ করে স্বধামে চলে গেলেন—কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পেছনে রেখে গেলেন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সোনার আদর্শ আর জগৎকে দান করে গেলেন

এগারজন সর্ব্বত্যাগী যুবক শিষ্য। তাই দেখি পরবর্ত্তীযুগে তাঁর সর্ব্বত্যাগী শিষ্যগণ রামকৃষ্ণের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেশে দেশে অভিযান করেছেন—জগতের সর্ব্বত্র বিশ্বধর্ম্মের জয়ধ্বজা প্রোথিত করতে সফল হয়েছেন !

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর সর্ব্বত্যাগী যুবক শিষ্যগণ গুরুর স্মৃতিচিহ্ন ও দেহাবশেষসহ বরাহনগরের একটী পুরাতন বাটীতে বসবাস করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সেখানে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো। এখানে সকলেই অতি কঠোর সাধনা করতে আরম্ভ করেন। কালীর তপস্যা এখানে ছিল আবার অতুলনীয়। মঠের একটী ছোট প্রকোষ্ঠে কালী অত্যুগ্র সাধনা করতে লাগলেন। এই সময় এক একদিন তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এঁকাসনে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর এই অত্যুগ্র তপস্যা দেখে নরেন্দ্রনাথ সাতিশয় বিস্মিত হয়ে তাঁকে "কালীতপস্বী" নামে অভিনন্দিত করলেন। আজও বরাহনগর মঠের সেই প্রকোষ্ঠ "কালীতপস্বীর ঘর" নামে রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে পরিচিত। বরাহনগর মঠে অত্যুগ্র সাধনার সম্বন্ধে একটী কাহিনী উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। "একদিন তিনি (অর্থাৎ কালী) মঠের বারান্দায় শুইয়া ধ্যান করিতেছিলেন, সঞ্চিত ধূলারাশির উপর তাঁহার দেহ মৃতবৎ অসাড়, নিস্পন্দ হইয়া আছে ; ইতোমধ্যে সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে কিঞ্চিৎ অবতরণ করিলে গ্রীষ্মকালীন প্রখর কিরণে ধূলিরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইয়া উঠিল। কিন্তু কালী পূর্ব্ববৎ

সংজ্ঞাবিহীন, কিছুক্ষণ পরে জনৈক গৃহীভক্ত মঠে বেড়াইতে আসিয়া কালীর অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং দেহে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন যে তাহা রৌদ্রতপ্ত ও অসাড়। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন দুঃসহ তপোকষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া কালীর জীবন বায়ু বহির্গত হইয়াছে, এবং দুঃখিতচিত্তে এই শোচনীয় সংবাদ ভিতরে আসিয়া যোগানন্দ স্বামীর সমক্ষে নিবেদন করিলেন, তাহাতে যোগানন্দ স্বামী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওকি মরে, ওই শালা অম্‌নি করে ধ্যান করে।" এই রকমের অসাধারণই ছিল কালীর তপস্যা। বরাহনগরের সেই পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠে দুয়ার রুদ্ধ ক'রে কালী ধ্যানজপের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর ও সুললিত স্তোত্রও রচনা করেন। "প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং"* শীর্ষক শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাটি কালীতপস্বী যখন শ্রীশ্রীমাকে পাঠ করে শোনালেন, তখন শ্রীশ্রীমা কালীর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন,— "তোর কণ্ঠে সরস্বতী বসুক্।" শ্রীশ্রীমায়ের এই বাণীও তাঁর জীবনে সফল হয়েছিল। এই সময় তিনি "কালী বেদান্তী" নামেও গুরুভাইদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন!

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেই নরেন, রাখাল, কালী প্রভৃতি ঠাকুরের সর্ব্বত্যাগী যুবক শিষ্যগণের অনেক আরাধ্য গুরুদেবের পাদুকা সম্মুখে স্থাপন করে যথারীতি বিধিমতে বিরজাহোম করেন ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। কালীর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান

* স্তোত্র-রত্নাকর—স্বামী অভেদানন্দ।

থাকায় তিনিই বিরজাহোমের তন্ত্রধারক হলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের নাম রাখলেন 'বিবিদিষানন্দ' ও অপর সকলকে নিজ নিজ বিশেষ ভাবানুযায়ী বিশেষ বিশেষ নাম দিলেন। কালী অদ্বৈত বেদান্তমত পোষণ করতেন এবং অভেদজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন—তাই তাঁর নাম হলো "অভেদানন্দ"। সত্যই নামের মধ্যেই কালীর জীবনের গভীরতম সত্য নিহিত রয়ে গেলো। এখন থেকে তিনি স্বামী অভেদানন্দ নামেই পরিচিত হতে লাগলেন। এই সময় তিনি পাণিণিব্যাকরণ, ষড়্দর্শন, বেদ, উপনিষদ ও পাশ্চাত্যের নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে স্থুরু করলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের কিছুদিন পরেই অন্যান্য গুরুভ্রাতার সঙ্গে অভেদানন্দ তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। এই সময় তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন—টাকা পয়সা আদৌ স্পর্শ করতেন না এবং নগ্নপদে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতেন। এই সময় ছেঁড়া কাথা নিয়ে আর ইট মাথায় দিয়ে রাত্রি গাছের তলায় কাটাতেন। এই সময় তিনি সর্ব্বদাই মনে পোষণ করতেন যে "the phenomenal world was transitory and unreal; that I was a spectator like the unchangeable Atman of Vedanta which always remains a witness of the games which the people were playing in the world".* এইভাব নিয়ে ভারত ভ্রমণ করতে স্থুরু করেন। সমস্ত দুঃখ কষ্টকে তিনি সেদিন সানন্দে বরণ করে নিয়ে ছিলেন। কখনো

* Contemporary Indian Philosophy—Page, 50.

গঙ্গা ও যমুনার তীর ধরে চলেছেন—আবার কখনো তীর্থদর্শন করছেন বা আবার কখনো ১৪০০ ফিট উচ্চে হিমালয়ের এক নির্জ্জন গহ্বরে ব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন। এই ভ্রমণকালে তিনি হৃষীকেশে এসে ষড়দর্শনবিৎ বেদান্তী সাধু ধনরাজগিরির সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর কাছে বেদান্ত যথাযথভাবে অধ্যয়ন করেন। ধনরাজগিরি তাঁর মনীষার পরিচয় পেয়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পরবর্ত্তীকালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছে আসেন ও জানতে পারেন বিবেকানন্দ অভেদানন্দের গুরুভাই—তখন সানন্দে নবাগত সন্ন্যাসীকে তিনি বললেন,—"অভেদানন্দ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা!" এই হৃষীকেশে অবস্থান কালেই অভেদানন্দ বিষ্ঠা ও চন্দনের অভেদ জ্ঞানের সাধনা করেন এবং পরিশেষে সে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাকসিদ্ধ হয়েছেন কিনা পরীক্ষার জন্য তিনি মাঝে মাঝে নিদারুণ রোগ আহ্বান করতেন—কয়েকদিনের মধ্যেই কঠিন পীড়া এসে তাঁকে আক্রমণ করতো। সেই মরণাপন্ন অবস্থায়ও দেহবুদ্ধি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর মধ্যে জাগেনি—এই সময়ও তিনি নির্বিকারচিত্তে বার বার বলতেন,—"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং; আত্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ।" এইভাবে তপস্যা ও আত্মপরীক্ষা করতে করতে অভেদানন্দ আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি আবার ভারতের নানাতীর্থ ও বিখ্যাত জায়গা পর্য্যটন করতে সুরু করেন। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সকল স্থানেই তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করেন। কখনো শাস্ত্রাধ্যয়ন বা কখনো ধ্যানধারণা এইভাবে তাঁর

সময় কাটতো। এলাহাবাদের নিকটস্থ যমুনার পরপারে ঝুসিতে তিনি এই সময় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে অতি কঠোর তপস্যায় রত হলেন। এখানে তিনি দশ বারো ঘণ্টা একাসনে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নিকটবর্ত্তী Fort থেকে যখন তোপের প্রচণ্ড আওয়াজ করা হতো—তাও তিনি শুনতে পেতেন না। এমনি ছিল তাঁর মনের একাগ্রতা ও সাধনায় নিষ্ঠা! ভারত ভ্রমণের সময় তিনি ভারতের কয়েকজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ করেন। তারমধ্যে পাওয়ারী বাবা, তৈলঙ্গস্বামী; ভাস্করানন্দই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর থেকে প্রায় দশ বৎসর এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এমন সময় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে বিবেকানন্দ তাঁকে আহ্বান করে চিঠি লিখ্‌লেন।

স্বামী অভেদানন্দ

তৃতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা, প্রচার-কার্য্যের দায়িত্ব-গ্রহণ ও ভারতের বাণী প্রচার।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে (Parliament of Religions-এ) ভারতবর্ষীয় মহিমা ও গৌরব সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। বিবেকানন্দের সেই সতেজ কণ্ঠে অনর্গল ও ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাণময় বক্তৃতার সামনে অন্যান্য ধর্ম্মপ্রতি-

নিধিদের বক্তৃতা কত অসার ও অকিঞ্চিৎকর তা সেদিন আমেরিকা বাসীরা বুঝতে পেরেছিল। নবাগত তরুণ সন্ন্যাসীর উদাত্তকণ্ঠের বাণী শ্রবণের জন্য আমেরিকার বহু নরনারী পাগল হয়ে উঠ্‌লো। বিবেকানন্দের এই অপূর্ব্ব সাফল্য দর্শনে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধি-গণ আবার নানাপ্রকার কুৎসা রটাতে লাগলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সে সভায় গিয়াছিলেন বিখ্যাত মনীষী ও ধর্ম্ম-প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনিও খ্রীষ্টান মিশনারিগণের সঙ্গে যোগদান করে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীর মনে নানাপ্রকারের বিদ্বেষভাব ছড়াতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা প্রচার করে দিলেন চারিদিকে যে বিবেকানন্দ সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নহেন এবং তিনি যা বলেছেন আসলে তা হিন্দুধর্ম্মও নহে ইত্যাদি। এই সময় হিন্দুজাতির পক্ষ থেকে বিবেকানন্দকে সমর্থন করার একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সে সময় যদি বিবেকানন্দ সেখানে প্রতিষ্ঠা না পেতেন তবে সেটা হতো জাতির পক্ষে একটা চরম দুর্ভাগ্যের কথা। বিবেকানন্দ আমেরিকার সমস্ত সংবাদ ভারতে তাঁর গুরুভাইদের জানালেন এবং তাঁকে সমর্থন করে অতি শীঘ্র চিঠি লিখতে বলতেন। বিবেকানন্দের এই বিঘ্নের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সোদর প্রতিম স্বামী অভেদানন্দ ও শশী মহারাজ মাননীয় প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। সে সময় দেশেও নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়। সকল বাধাকে দলিত মথিত করে স্বামী অভেদানন্দ বিপুল প্রচেষ্টার দ্বারা সে সভার কার্য্য

সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করলেন। সেই সভায় এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে বিবেকানন্দই সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিনিধি— এবং তাঁর বাণীই হিন্দুধর্ম্মের বাণী। সভান্তে স্বামী অভেদানন্দ সমগ্র আমেরিকাবাসীকে ধন্যবাদ দিয়ে ও বিবেকানন্দকে সমর্থন করে পত্র পাঠালেন। এর পরেই আমেরিকাবাসিগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে বিবেকানন্দকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করে নিল। বিশ্ব-পূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখেছেন,—"কালীবেদান্তী (অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ) প্রাণপণে এই সময় খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউনহলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্য্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং সভার রিপোর্টগুলি প্রেসে পাঠান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তিনি সাধনার মত করিয়াছিলেন।" পরবর্ত্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার কথা স্বীকার করে গেছেন !

যাই হোক বিবেকানন্দের আহ্বানকে স্বামী অভেদানন্দ স্বয়ং পরমহংসদেবের আদেশ মনে করে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই সময় তাঁর মানসিক অবস্থা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য করবার বিষয়। এতদিন স্বদেশের মাটিতে একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ায় তিনি জীবন কাটাচ্ছিলেন— তারপর আবার তিনি নিরামিষভোজী। ইংলণ্ডের মতো নূতন ও অপরিচিত দেশে তিনি কিভাবে থাকবেন—আর কিভাবেই বা

বিবেকানন্দকে সাহায্য করবেন—এই রকম নানা চিন্তায় তাঁর মন বিচলিত হতে লাগলো। যাই হোক নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাজে আরোহণ করলেন। বিরাট জলসাগর মন্থন করে জাহাজ ভীমবেগে ছুটে চললো—আর ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সজলনয়নে বার বার জন্মভূমির দিকে তাকাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে মাতৃভূমির শেষ সীমারেখাও তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কত রাত্রি, কত দিন জাহাজে কেটে যেতে লাগলো। একবার ভারত-ভূমির দৃশ্য আর একবার অপরিচিত লণ্ডনের ছবি তাঁর মনে এসে বার বার জেগে উঠ্‌তে লাগলো। এমনি করে কিছুদিন কেটে যাবার পর যথাসময়ে তিনি লণ্ডনে এসে পৌছলেন এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন। ইতিপূর্ব্বেই স্বামী বিবেকা-নন্দ বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করে দিয়েছিলেন; সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—সম্প্রতি তাঁর এক গুরুভাই এসেছেন—তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই পরবর্ত্তী সভায় বক্তৃতা করবেন। বক্তৃতার কথা যখন অভেদা-নন্দকে প্রথম জানানো হলো তখন তিনি ভীত ও বিস্মিত হয়ে পড়লেন এত বড় কঠিন কাজে তিনি কি করে নামবেন। সে সভায় উপস্থিত থাকবেন আবার লণ্ডনের সম্ভ্রান্তবংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত বহু নরনারী। তা ছাড়া তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও ইংরাজী তো দূরের কথা, বাংলা বা সংস্কৃতেও কোন বক্তৃতা করেন নি। সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কাজটা এই সকল নানা কারণে তাঁর নিকট অসম্ভব বলেই মনো হলো। বিবেকানন্দের সঙ্গে এনিয়ে কত তর্কই না তিনি করলেন। অবশেষে বিবেকানন্দ কালীবেদান্তীকে

বলতেন, "আমি যাঁর মুখ পানে চেয়ে বক্তৃতা দিয়েছি, তুমিও তাঁর মুখ পানে চেয়ে বক্তৃতা দাও।" এই কথায় তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে এবং নিজের উপরে অপরিমেয় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ঠাকুরের নাম স্মরণ করে তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে সভায় উপস্থিত হলেন। সভাগৃহের নাম ছিল London Christo Theosophical Society আর বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্তের "পঞ্চদশী তত্ত্ব"। যথাসময়ে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠ্‌লেন। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথা পর্যান্ত একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল ভয় ও দুর্ব্বলতা কোথায় যেন অপসারিত হলো। অনর্গল ওজস্বিনী ভাষায় আগুনের মত বেদান্তের কথাগুলি তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরুতে লাগলো! তাঁর সেই জ্বলন্ত ভাবধারাকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা গোমুখী থেকে উৎসারিত জাহ্নবীর বিপুল প্রবাহের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। বক্তৃতা যখন শেষ হলো তখন চারিদিক থেকে শত শত উৎসুক নয়ন ভারতের এই নবাগত তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হলো। সকলেই সেদিন বুঝতে পারলো যে স্বামী অভেদানন্দ বিবেকানন্দের যথার্থ ই যোগ্য গুরুভাই। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সেই সভায় গুরুভ্রাতার এই আশাতীত সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন,—"Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it." তিনি আরও বললেন, "You have a resonant voice which has carrying power too."

এই বক্তৃতা শুনেই বিবেকানন্দের ইংরাজ শিষ্য Capt. Sevier বলেছিলেন,—"Swami Abhedananda is a born preacher. Wherever he will go he will have success." পাশ্চাত্যদেশে যিনি সুদীর্ঘকাল ভারতের বাণী ও রামকৃষ্ণগৌরব প্রচার করবেন পাশ্চাত্যজগতে তাঁর প্রচারকার্য্য এভাবেই আরম্ভ হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই নবাগত গুরুভ্রাতার কর্ম্মযোগ্যতা সম্বন্ধে খুবই উচ্চমত পোষণ করতেন। তাই তিনি কিছুদিন পরেই স্বামী অভেদানন্দের উপর প্রচারকার্য্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত করে ভারতবর্ষে চলে আসেন। লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে স্বামী অভেদানন্দ সাতিশয় দক্ষতার সহিত একবৎসর বেদান্ত প্রচার করলেন। এখানে অবস্থান কালে তিনি Prof. Maxmuller ও Prof Paul Deussen প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। স্বামিজীর ধর্ম্মব্যাখ্যা লণ্ডনের লোকেরা কত আগ্রহসহকারে শুনতো ও কি বিপুলভাবে উপকৃত হতো, তা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত Miss Noble (ভগিনী নিবেদিতা), Mr. Sturdy-র লেখা থেকেই সম্যকরূপে বুঝতে পারি। Mr. Sturdy ও Sister Nevedita স্বামিজীর ধর্ম্মব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই তাঁর ক্লাসে যোগদান করতেন। এইভাবে একবৎসর স্বামিজী লণ্ডনে বেদান্ত-প্রচার করলেন এবং পাশ্চাত্যবাসীর মনে ভারতের প্রতি একটা সত্যি-কারের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগিয়ে দেন। এদিকে নিউইয়র্ক থেকে

ক্রমাগত আমন্ত্রণ তাঁর কাছে আসতে লাগলো। অবশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের নির্দ্দেশে তিনি আমেরিকায় গমনের সঙ্কল্প করলেন। লণ্ডন বেদান্ত সোসাইটির সভ্যগণ স্বামিজীর বক্তৃতায় সাতিশয় উপকৃত হয়েছিল। তাই দেখি স্বামিজীর আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বল্‌ছে,—"আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা যেন আমাদের মস্তকের উপর ঝড়ের মত চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার উচ্চ উচ্চ কথার ভাবগুলি আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। আপনার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা আমরা বেদান্তের মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি এবং আমাদের মনের অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আপনি নিউইয়র্কে যাইতেছেন, কিন্তু তথায় বেশীদিন থাকিবেন না। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। আপনাকে আমরা কখনই ভুলিতে পারি না।" *

যাই হোক কর্ম্মের বিপুল আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেই নিউইয়র্কে এসে পদার্পণ করলেন। এইসময় তিনি একরূপ নিঃসম্বল ছিলেন বল্‌লেই চলে। মাত্র কয়েকজন বেদান্তানুরাগী শিক্ষার্থী নিয়ে তিনি কাজে নামলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি এক চিঠিতে লিখে পাঠালেন যে—তুমি তোমার আমেরিকান শিষ্যদের চিঠিতে লিখে দাও বেদান্ত-প্রচারে আমাকে সাহায্য করবার জন্য

* বিশ্ববাণী—১৩৩৬—চৈত্র।

তার প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ অভেদানন্দকে লিখলেন,—আমার শিষ্যদের উপর নির্ভর না করে তুমি নিজেই নূতন কর্মক্ষেত্র তৈরী করে নেও। এইভাবে বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতাকে স্বাবলম্বনের পথ প্রদর্শন করলেন।

এখন থেকে স্বামী অভেদানন্দ বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যদের উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে নিজেই নিজের পথ কেটে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে লগলেন। যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে বক্তৃতা করা ছাড়াও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ছয়মাসে একমাত্র নিউইয়র্কের সুবিখ্যাত Mott Memorial Hall—তেই নব্বুইটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। যারা উদার প্রকৃতি ও জিজ্ঞাসু তারা জ্ঞানের এই একনিষ্ঠ তরুণ তপস্বীর প্রতিভাকে সাগ্রহে বরণ করে নিলেও—চার্চ্চের মিশনারিগণ তাঁর বিরুদ্ধে নূতন নূতন মিথ্যা কথা জাতির কাছে প্রচার করতে লাগলো। খৃষ্টান মিশনারিগণ একদিকে ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে জগতের সম্মুখে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বারে বারে শতস্কন্ধ দানবের মত বিষাক্ত ফণা বিস্তার করেছে; পরক্ষণেই স্বামী অভেদানন্দ দৃপ্ত সিংহের ন্যায় হুঙ্কার দিয়ে আমেরিকাবাসীকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ বর্ব্বর ও পৌত্তলিকের দেশ নয়—জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার চিরন্তন লীলা নিকেতন। বিদেশে নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থার মধ্যে থেকেও ধর্ম্মান্দোলন করতে হলে যে অসাধারণ শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—তা নিয়েই জন্মে ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। কোন প্রকারের অন্তরায়ই তাঁর সঙ্কল্পকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত

করতে পারে নি ; কতবার ঝড় উঠেছে আকাশে—কিন্তু সেই ঝড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়েই তিনি চালিয়েছেন সনাতন ধর্ম্মের দিগন্তব্যাপী অভিযান। কোনপ্রকারের প্রতিকূলতাই তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারেনি—তাঁর কর্ম্মের গতিবেগ ছিল বাঁধ-ভাঙা নদীর মতোই অতি দুর্ব্বার ও প্রচণ্ড। দিনের পর দিন চলে গেলো—আর তাঁর প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও চিত্তাকর্ষক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার কাহিনীও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ হলো! Mott Memorial Hallএ স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে একজন শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসীর মন কি ভাবে আলোড়িত হয়েছিল, তা এখানে বলি। With the Swamis in America নামক দেশবিদেশ-বিখ্যাত গ্রন্থে লেখক এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই শিক্ষিত পাশ্চাত্য দেশবাসী (যিনি পরে স্বামী অতুলানন্দ নামে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে পরিচিত) একদিন Mott Memorial Hallএ বক্তৃতা শুনতে গেছেন ; যথাসময়ে একজন তরুণ সন্ন্যাসী সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করেই তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। এই বক্তৃতা তাঁর মনকে কি ভাবে স্পর্শ করেছিল, তা তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করেই বলি,—"The discourse was lucid, convincing, and impressive. It was a straight—forward well-reasoned-out exposition of the Vedanta philosophy, delivered in a calm, dignified manner. He had his subject well in hand. And

his voice was clear and sonorous". এই বক্তৃতা শুনেই লেখক বক্তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং অনুসন্ধানে জানলেন যে ইনিই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ। এই ব্যক্তি অন্যান্য তিনজনের সঙ্গে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বামিজীর কাছে দীক্ষিত হলেন এবং যোগসাধনা শিক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে স্বামিজীর কর্ম্মক্ষেত্র সুগম ও সুপ্রশস্ত হয়ে উঠ্লো।

বেদান্তের বিজয়বাণী স্বামীজির লেখনী ও বক্তৃতার থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো! নিউইয়র্কের মৃতকল্প বেদান্তসমিতি স্বামী অভেদানন্দের স্পর্শে অল্পদিনের মধ্যেই পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠ্লো এবং উহাকে স্থায়ী বাসভবনে স্বামিজী প্রতিষ্ঠিতও করেন। মামুলীপথ ধরে তিনি কোন দিনই ধর্ম্ম প্রচার করতেন না।—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের অটল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা করতেন। তাই তাঁর বক্তৃতা মানুষের এত মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে পুরাতনের জয়ধ্বনি থাকলেও—অন্ধবিশ্বাসের লেশমাত্রও ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত ধর্ম্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে প্রচার করার জন্য তিনি আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে একনিষ্ঠ ছাত্রের মত Physiology, Anatomy, Anthropology, Neurology প্রভৃতি নানা বিষয় অধ্যায়ন করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এ সকল বিষয় আয়ত্ত করে ফেলেন। যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম প্রচার করাতে

শতশত শিক্ষিত নরনারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। বিবেকানন্দের নেতৃত্বে যে বেদান্ত প্রচার কার্য্য একদিন ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ হয়েছিল—স্বামী অভেদানন্দের অসীমধৈর্য্য ও অক্লান্ত সাধনার ফলে তা প্রকাশ্য আন্দোলনে পরিণত হলো। এই ধর্ম্মান্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী তাই লিখেছেন—

"The Swami (Abhedananda) became popular and his work increased. He was a very busy man, lecturing, holding classes, giving private instructions and writing books on Vedanta. * The society flourished, the intellectual world was attracted. The Swami was invited to speak before University assemblies and to address different clubs and societies. What had begun in a private unostentatious manner, developed into public movement". স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শোনার পর সত্য সত্যই শ্রোতাদের মনে বিপুল ধর্ম্মপ্রেরণা জাগতো। পেশাদারী প্রচারক তো আর তিনি ছিলেন না—তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও দার্শনিক; কাজেই তাঁর কথার মধ্যে কোন প্রকারের অস্পষ্টতাই ছিল না। জ্বলন্ত ভাষায় অনর্গলভাবে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি মানুষকে বুঝিয়ে যেতেন—ও তাকে একটা মহান গৌরবালোকে উন্নীতও করতেন। তিনি সার্ব্বজনীন

* With the swamis In America—by an western disciple.

ধর্ম্ম প্রচার করতেন—যা যুক্তি, বিজ্ঞান, ও দর্শনের সর্ব্বোচ্চ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত! তাই তাঁর বক্তৃতা গোঁড়া খৃষ্টানগণও অনেক সময় উদার হৃদয় মনস্বীদের ন্যায় অতি আগ্রহসহকারে শুনতেন। * স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে অল্পকালের মধ্যেই আমেরিকার বহু বিখ্যাত মনীষিবৃন্দ স্বামিজীর একান্ত গুণমুগ্ধ বন্ধুতে পরিণত হন। এঁদের মধ্যে Herber Newton, Lanman, Hiram Corson, Royce, William James প্রভৃতি সুবিখ্যাত সুধীর নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী আমেরিকার সমস্ত বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন এবং সকলকেই নিজ প্রতিভাদ্বারা মুগ্ধ করে দেন। তাই আমেরিকার বহুবিখ্যাত পত্রিকাতে প্রায় লেখা থাকতো,—"স্বামী অভেদানন্দ এই মহাদেশে হিন্দুদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা।" ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে স্বামিজীর সঙ্গে William James এর "Unity of the Ultimate Reality" নিয়ে এক সুগভীর আলোচনা হয়। আলোচনা প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে হয়েছিল। কিন্তু "Even Professar James (who is perhaps the greatest living psychologist) was finally forced to admit

* "Swami Abhedananda, always strong and positive, followed his own consent. He wanted to spread Vedanta, he had to follow his own plan. And he flourished. He became a very fine speaker. He was called to other cities to lecture. He was loved, admired, and applauded wherever he went" —With the Swamis in America.

that from the Swami's standpoint it was impossible to deny ultimate unity, but declared that he still could not believe in it." * এই আলোচনার কথা স্বয়ং স্বামিজীও Contemporary Indian Philosophy-তে লিখেছেন, "In 1898, Professor William James held a discussion with me in his house on the problem of the "Unity of the Utlimate Reality'. This discussion lasted for nearly four hours, in which Professor Royce, Professor Lanman, Professor Shaler and Dr. James, the chairman of Cambridge philosophical conferences, took my side and supported my arguments in favour of "Unity". এই বৎসরই স্বামিজীকে আবার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্‌লী সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় সভা White House-এ সম্বর্দ্ধিত ও অভিনন্দিত করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসেন এবং লক্ষ্য করলেন যে বেদান্ত প্রচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি দেখলেন যে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটী স্থায়ী বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত। অভেদানন্দের এই অপূর্ব্ব সাফল্যলাভে সবিশেষ প্রীত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌লেন,—"Thrice I knocked at the door of Newyork, but it did not

* Toronto Saturday Night—1898.

respond, I am glad that you have established its permanent headquarters. This is the first time I have found our own home at Newyork". এর পর স্বামী বিবেকানন্দ আবার অভেদানন্দের উপর প্রচার কার্য্যের যাবতীয় দায়িত্ব সমর্পণ করে ভারতে চলে আসেন। স্বামী অভেদানন্দের কর্ম্মদক্ষতায় বিবেকানন্দের সবিশেষ আস্থা ছিল। তাইতো দেখি এই সময় অভেদানন্দকে লিখিত এক পত্রে আছে—"..........I have no direction to give, I leave the work entirely to you".

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দের এক শিষ্যা তাঁকে স্যানফ্রানসিস্কো সহর থেকে খানিকটা দূরে একশত একার পরিমিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডদান করেন। স্বামী অভেদানন্দ উহা রামকৃষ্ণমিশনের হাতে সমর্পণ করলে বিবেকানন্দের নির্দ্দেশে সেখানে তুরীয়ানন্দ "শান্তি আশ্রমের" প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আসেন স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করার জন্য। এই সময় অভেদানন্দের নিকট চারিদিক থেকে কর্ম্মের বিপুল আহ্বান আসতে লাগলো। স্বামী তুরীয়ানন্দকে এক্ষণে তাঁর অনুপস্থিতিতে নিউইয়র্ক সমিতির কার্য্যভার গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করে স্বামিজী এই সময় হার্ভার্ড, ক্লার্ক, বার্কলি, কলোম্বিয়া, কর্ণেল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্মেলনে, Spiritualistic society-তে, নানাপ্রকার চার্চ্চে, ক্লাবে ও প্রতিষ্ঠানে স্বামিজী ভ্রাম্যমান পরিব্রাজকের ন্যায়

বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এখন তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দের প্রচার কার্য্য কি ধরণের ছিল -- সে সম্বন্ধে জনৈক পাশ্চাত্য দেশবাসী লিখেছেন,—Swami Abhedanada went ahead, ploughed new fields, planted new seeds. Swami Turiyananda took charge of the growing plants".

আমেরিকার নরনারী স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনে কি ভাবে উপকৃত হত—তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে The Sun, The Newyork Tribune, The Critic, The Literary Digest, The Times, The Intelligence, The Mind প্রভৃতি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই অভেদানন্দের উচ্চ প্রশংসা থাকতো। স্বামিজীর Reincarnation ; Evolution and Reincarnation ; Which is Scientific—Resurrection or Renicarnation প্রভৃতি বক্তৃতা এতই চমকপ্রদ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যুক্তিভরা ছিল যে মিঃ ভ্যাণ্ডারবিল্ট (Vanderbilt) নামক একজন আমেরিকান ভদ্রলোক পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনটি বক্তৃতা একত্র করে নিজেই দু'হাজার কপি ছাপিয়ে দিলেন। বইখানার নাম হলো 'Reincarnation'। এই বইখানার অকাট্য যুক্তি ও পুনর্জন্মবাদ প্রতিষ্ঠার অতি অদ্ভুত বিশ্লেষণী শক্তি লক্ষ্য করে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও এর উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য বক্তৃতাগুলি ক্রমে ক্রমে Self-knowledge, Divine Heritage of Man, How to be a yogi, Philosophy of

Work, Spiritual Unfoldment প্রভৃতি নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে লাগলো। এই সকল গ্রন্থের বাণীগুলি আমেরিকাবাসীর অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করেছিল। এ ছাড়া স্বামিজী নিউইয়র্ক থেকে Vedanta Monthly Bulletin নামক একটী উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত করতে আরম্ভ করেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে এই নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি থেকে 'Gospel of Ramkrishna' নামে স্বামী অভেদানন্দ লিখিত ভূমিকাসহ একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বইখানা পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের কয়েকটি বিশিষ্ট ভাষায় অনূদিত হয়ে যায়। এই বইখানা অগণিত নরনারীর মধ্যে ধর্মের বিপুল প্রেরণা দিয়েছিল। অষ্ট্রিয়ার সুবিখ্যাত চিত্রকর Frank Dvorak এই গ্রন্থখানি পাঠ করে ঠাকুরের ভাবে এতই বিভোর হয়েছিলেন যে ঠাকুরের এক জীবন্ত ছবি চিত্রিত করেন এবং নিউইয়র্ক স্বামিজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে Broklyn Institute of Arts and Science এর Director Dr. Franklin W. Hooper কর্ত্তৃক আহূত হয়ে স্বামিজী সেখানে ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে মৌলিক ও গবেষণা পূর্ণ কয়েকটি বক্তৃতা ধারাবাহিক ভাবে প্রদান করেন। এই বক্তৃতাগুলিই তারপর India And Her People নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এত অল্প কথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এমন সুন্দর ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ খুব কমই আছে! দেশবিদেশ-বিখ্যাত

ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর 'Civilazation in Ancient India, নামক বিশাল গ্রন্থে যা করতে চেয়েছেন—স্বামী' অভেদানন্দ তাঁর India And Her People-এ স্বল্পকথায় তাই করেছেন। এই একখানি বই পড়লেই বুঝা যায় কি অসাধারণ ছিল তাঁর মনীষা, কি উদার ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কি বিশাল ছিল তাঁর জ্ঞানের পরিধি। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমেরিকার প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলিতে যে উচ্চ অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়। সেখানকার একখানি বিখ্যাত পত্রিকা লিখেছে,—"The book has more than usual interest as coming from one who knows the occident and both knows and loves the Orient. It is decidedly interesting. The book has two admirable qualities : breadth in scope and suggestiveness in materials." Washington Evening Star ঐ বইখানার সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছে, "It is a valuable contribution to Western know-ledge of India, containing precisiely what the American wants to know about India." আর একখানি পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করেছে যে, "It is impos-sible to quarrel with this book. He (Swami Abhedananda) writes too interestingly and he is a man with a mission." এই বইখানি প্রকাশের পর

"ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিশেষ সাড়া পড়ে এবং ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন সম্পর্কে শিক্ষিত নরনারীদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার হয়; তখনকার ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তক ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। দীর্ঘকাল পরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।*" এই বইখানার প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে ভারতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও অন্তহীন সহানুভূতি। ভারতের যা দুঃখ ও বেদনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা—তা তিনি পাশ্চাত্যবাসীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেন! ভারতবর্ষের সুখদুঃখকে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই ভারতের হাসিকাঁন্নার এতখানি সহানুভূতি দেখাতে পেরেছিলেন।

এইভাবে দীর্ঘ দশবৎসরকাল সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকায় ও ইউরোপে বেদান্তধর্ম্ম ও রামকৃষ্ণবাণী প্রচারের পর স্বামী অভেদানন্দ ভারতে আসেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। তখন সমগ্র ভারত স্বামিজীকে বিজয়ী সম্রাটের মতোই অভিনন্দিত করেছিল। কলম্বো থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজ, মহীশূর, বম্বে, চন্দননগর, কলিকাতা, বারাণসী প্রভৃতি ভারতের সকল বিখ্যাত স্থান থেকেই তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। যেখানেই স্বামিজী যেতেন, সেখানেই তাঁর বক্তৃতা একটা জাগরণের চাঞ্চল্য ও আত্মমর্য্যাদার আনন্দ সঞ্চার করতো। সে সময় সমগ্র ভারত স্বীকার করে নিয়েছিল যে অভেদানন্দ বিবেকানন্দের প্রকৃতই যোগ্যতম গুরুভাই। বিবেকানন্দের পর আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম ও

* আনন্দ বাজার পত্রিকা। ৯।৯।৩৯।

দর্শনপ্রচারে অভেদানন্দের দানই যে সব থেকে বেশী—— তাও জাতি সেদিন সহজেই বুঝতে পেরেছিল। **Swami Abhedananda's Lectures and Address in India** নামক বইখানা পড়লেই পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির যথার্থ সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়াঙ্গম করা যায়!

ভারতভ্রমণকালে স্বামিজী শুধু ধর্ম্ম আর দর্শন সম্বন্ধেই বক্তৃতা করতেন না—রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা মূল্যবান কথা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বলতেন। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ সবেমাত্র বাঙলা ও ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে কালের রাজনৈতিক মনীষিগণের চিন্তাধারার সঙ্গে ভারত সংস্কারের জন্য নব নব ভাবধারা স্বামিজীও মিলিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা পেতে গেলে নিজেদের ব্যক্তিগত ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা জাতীয় আদর্শের বেদীমূলে বলি দেবার একান্তই প্রয়োজন। এই আত্মত্যাগই হচ্ছে জাতীয় উন্নতির প্রকৃত ও প্রধান ভিত্তি। আমরা যদি আজ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ভুলে গিয়ে মহান আদর্শের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারি, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবে না; কেন না সকল শক্তির মূলে রয়েছে ঐক্য। এই কথা সে যুগে স্বামিজী দেশবাসীকে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন,— "We must sacrifice our individual opinions for the sake of an ideal, otherwise we shall be crushed by a greater organised power that

threatens us from a distance. If we are united and well-organised, there is no power on earth which can resist us.” আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা যে কত বেশী তা-ও তিনি লক্ষ্য করেছেন। শুধু হৈ চৈ করে আর উপর থেকে জোড়াতালি দিয়ে কোন জাতিই সংগঠিত হতে পারে না—জয়ী হওয়া তো দূরের কথা। জাতি সংগঠনের জন্য সবার আগে চাই ভিতর থেকে সংস্কার ও বল-সঞ্চয়। বিবেকানন্দের ন্যায় তাই অভেদানন্দও জাতীয় জীবনের গোড়ার গলদগুলি অপসারণের দিকেই বিশেষ জোর দিলেন। আজ যে ভারতের অগণিত নরনারী অজ্ঞতায় ও অশিক্ষায় সভ্যজগতের থেকে ঢের পশ্চাতে পড়ে আছে—আজ যে তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল বহন করতে হচ্ছে—এর কারণ আমাদেরই ঐক্যহীনতা, স্বার্থপরতা ও আমাদেরই বিচ্ছৃঙ্খলা। স্বামিজী তাই দুঃখ করে বলতেন,—“৪ কোটি ইংরাজের উদ্দেশ্য এক ; ৪ কোটি তিশ লক্ষ জার্ম্মাণের উদ্দেশ্য এক, ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিণের উদ্দেশ্য এক ; আর আমাদের ৩০ কোটি লোকের ৩০ কোটি উদ্দেশ্য, ৩০ কোটি আদর্শ।”* জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ‘obedience to leader’, ‘discipline’ এবং ‘unity of purpose.’ জাতি যখন বৈষম্যে ও আত্মকলহে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন তাকে শক্তির মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে জাতীয়তার

* বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি ; কিন্তু সে সময়ে অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটিই ছিল।

পথে পরিচালিত করা খুবই কঠিন। সেই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার স্বামিজীও অন্যান্য স্বদেশপ্রেমিকের ন্যায়ই গ্রহণ করেছিলেন। সেই জাগরণের প্রথম যুগে তিনিও জাতির কানে এক ও অখণ্ডজাতীয়তার বজ্রবাণী শুনিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বক্তৃতাবলী ভারতের বিভিন্ন স্থানে একটা বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। দার্শনিক অভেদানন্দকে ছেড়ে দিয়েও জাতি-সংগঠয়িতার যে মূর্ত্তিতে তাঁকে পাই তা আমরা কোনদিন বিস্মৃত হতে পারবো না; জাতীয়ভাবের ও আদর্শের তিনি সত্যই ছিলেন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তিনি যখনই যেখানে থাকতেন ভারতের মঙ্গলের কথা সেখান থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করতেন। ভারতবর্ষ তাঁর সত্তার মধ্যে ওতঃপ্রোত ছিল; তাই জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা কোন অবস্থাতেই হ্রাস পায়নি। ভারতের সাধনা ও সভ্যতার গৌরব তিনি যে বিপুল আগ্রহে দেশে দেশে নগরে নগরে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারা যায় না। তিনি যে ভারতের প্রতিষ্ঠা মনেপ্রাণে কামনা করেছেন, সে ভারত হবে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সুমহান্, বৈজ্ঞানিক সাধনায় সমুন্নত ও ধর্ম্মের পবিত্র আলোকে সমুজ্জ্বল। জাতিকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য যে শিল্পোন্নতি বিশেষভাবেই প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে স্বামিজীর বক্তৃতাবলীও এখানে উল্লেখযোগ্য। বাল্যবিবাহের কুফল, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ—এ সকল বিষয়ও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি থেকে এড়াতে পারেনি। বাল্য-

বিবাহের ফলে একদিকে জাত সন্তানসন্ততি যেমন ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তেমনি অপরদিকে নারীশিক্ষাও উপেক্ষিত হয়ে যায়। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তা স্বামিজী সে যুগে ভারতের নগরে নগরে ঘোষণা করেছিলেন। ভারত ভ্রমণকালে এইভাবে স্বামিজী জাতীয় জীবনের নানাবিধ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন। ভারতের নরনারীর অপরিসীম দুঃখ দুর্দ্দশার সকরুণ কাহিনী ও বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর ঐ সময়কার বক্তৃতাবলীর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে! তাঁর "Lectures And Addresses in India" নামক পুস্তকখানা পড়লেই এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে এ সকল বিষয়গুলি বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে সংক্ষেপে কাজ শেষ করা হলো! যাইহোক, সাতমাস কাল ধরে ভারতভ্রমণের পর তিনি পুনরায় লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতভ্রমণের সময় বিবেকানন্দের সর্ব্বকনিষ্ঠ শিষ্য পরমানন্দের সেবায় তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; তাই যাবার সময় তাঁকেও সঙ্গে নিলেন।

যথাসময়ে স্বামী অভেদানন্দ পরমানন্দকে সঙ্গে করে লণ্ডনে পদার্পণ করলেন। এই সময় স্বামী অভেদানন্দের কয়েকজন বেদান্তানুরাগী ইংরাজ বন্ধু লণ্ডনে একটী বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। কিছুকালের মধ্যেই স্বামিজীর বিরাট প্রচেষ্টায় ও তাঁদের আগ্রহে লণ্ডনে আর একটি

বেদান্তকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো! যাইহোক, মাত্র দু'সপ্তাহ লণ্ডনে অবস্থানের পর তিনি পুনরায় পরমানন্দকে নিয়ে নিউইয়র্কে গমন করেন এবং বেদান্ত প্রচার কার্য্য পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করেন। এই সময় পরমানন্দের ইংরাজী শিক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে দেন। পরমানন্দও অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করলেন; এবং অভেদানন্দের নিকট প্রচারকার্য্যও শিক্ষা করলেন। স্বামিজীকে এই সময় বৎসরে একবার করে লণ্ডনে বক্তৃতা দেবার জন্য আসতে হতো। এইরূপে একবার তিনি লণ্ডন হতে নিউইয়র্কে ফিরে গিয়ে দেখ্‌লেন যে তাঁর স্নেহের পরমানন্দ তাঁর অজ্ঞাতসারে বোষ্টনে চলে গেছেন পৃথকভাবে কাজ করবার জন্য! এরূপ ব্যবহারও পরমানন্দের প্রতি স্বামিজীর স্নেহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারে নি। এই সময় অভেদানন্দের প্রচারকার্য্য শুধু যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আলাস্কা ও মেক্সিকোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না— সাগরপারের অক্সফোর্ড, প্যারিস, বার্লিন, কীল (জার্ম্মানী), জেনেভা, প্রাগ প্রভৃতি স্থানেও ছড়িয়ে পড়েছিল! তাঁর অতুলনীয় ধর্ম্মজ্ঞান, অপরিমেয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সুনিপুণ দার্শনিকতা ও অপূর্ব্ব চরিত্রমাধুর্য্য সকলকেই বিস্মিত করেছিল! বহু নরনারী তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করলেন। এদের মধ্যে অনেকেই তিনি হিন্দু নাম দিলেন, যেমন, রামদাস, হরিদাস, কালীমাতা, কৃষ্ণামাতা সত্যপ্রাণা, তেজস্বিনী, ভবানী ইত্যাদি, সিষ্টার সত্যপ্রিয়া নামে স্বামিজীর একজন বিদূষী ও ব্রহ্মচারিণী

শিষ্যা আছেন—তিনি বোষ্টনের একটি মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আমেরিকায় অবস্থান কালে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। একদিন স্বামিজী ঐ মহামনীষীর গবেষণাগারে প্রবেশ করে গম্ভীর চিন্তামগ্ন তপস্বীর ধ্যানগম্ভীর রূপ দর্শন করলেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনে ভারতীয় যোগীর কথাই বার বার জাগ্‌তে লাগলো। এডিসনও স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং অবশেষে তিনি একদিন তাঁরই আবিষ্কৃত একটি বিরাট গ্রামাফোন স্বামিজীকে প্রদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেই গ্রামাফোন আজও দার্জ্জিলিং আশ্রমে শোভা পাচ্ছে। পৃথ্বীখ্যাত ভ্রমণকারী ও উত্তরমেরু আবিষ্কারক (explorer) নানসেনের সঙ্গেও স্বামিজীর পরিচয় হয়। নানসেনের মুখে মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী স্বামিজী শ্রবণ করে সাতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করেছিলেন! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ Dr. Elmer Gates ও তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল মনীষী Ralph Waldo Trine, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক William Dean Howells, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশপ Rev Bishop Potter প্রভৃতি সকলেই তাঁর গুণে ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সুকবি স্বামী বেদানন্দ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণমিশনের যুবক সন্ন্যাসীদের হস্তে নিউইয়র্ক প্রচার

কেন্দ্রের ভার অর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ আপনার এক শিষ্য প্রদত্ত বার্কশায়ার নামক পল্লীপ্রদেশে ১২০০ একার (acre) জমিতে আপনার কয়েকজন শিষ্যকে লইয়া একটি আশ্রম করেন। এখানে তিনি ভারতবর্ষের ঋষিদের মত শিষ্যগণকে লইয়া বৃক্ষতলে আসনে বসিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা ও যোগশিক্ষা দিতেন। এই নিভৃত নির্জ্জন আশ্রমে তিনি থাকিলেও তাঁহাকে অনেক স্থানে যাইয়া বক্তৃতা করিতে হইত।"

এইভাবে বেদান্তধর্ম্ম ও রামকৃষ্ণমহিমা প্রচারোদ্দেশ্যে স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল আমেরিকায় অবস্থান করেন। এই পঁশিচটি বৎসর (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ) তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়টি তিনি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন আমেরিকায় ও ইউরোপে রামকৃষ্ণমিশনকে দৃঢ়ীভূত করবার জন্য। * এই সময়কার প্রতিটি বৎসরই ছিল ঘটনাবহুল ও অনুপম। আহারনিদ্রা বিস্মৃত হয়ে নানা প্রতিকূলতা ও বিপক্ষতার মধ্যেও রামকৃষ্ণমহিমা ও সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁর যে অক্লান্ত ও অতুলনীয় সাধনা—তা যুগে যুগে ধর্ম্মপ্রচারকদের বিরাট প্রেরণা প্রদান করবে। আদর্শের জন্য তাঁর ত্যাগ ও তপস্যা শুধু ভারতের ইতিহাসেই নয়—যে কোন দেশের ইতিহাসেই সুদুর্ল্লভ। তাঁর অসংখ্য বক্তৃতাবলী ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নক্ষেত্রে সমাগত নরনারীকে উপদেশপ্রদান সত্যসত্যই আমেরিকাবাসীর ধর্ম্মজীবনে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন এনেছিল

* Hindusthan Standard, 9-9-39

—তা এখানে উল্লেখ না করে পারি না। চিরদিনই মানুষ চার্চ্চের নিকট হতে শুনে এসেছে—"Hell-fire doctrine' ও 'eternal damnation'-এর কথা। চার্চ্চ যুগযুগান্তর ধরে মানুষের কানে শুনিয়েছে—'man is born in sin' (অর্থাৎ মানুষ আজন্মপাপী), দয়াময় খ্রীষ্টের সাহায্য ভিন্ন আত্মোন্নতি ও স্বর্গে প্রবেশ সম্ভব নয়। ধর্ম্মজীবনে অন্ধবিশ্বাস ও চিরাগত প্রথারই প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল—যুক্তি ও বিচার ও 'rational knowledge'-এর কোন স্থানই ছিল না। সূর্য্যের আগে পৃথিবীর জন্ম—আকস্মিকভাবে পৃথিবীর এই বর্ত্তমান পরিণতি—খ্রীষ্টই একমাত্র ভগবানের সন্তান (only begotten Son of God) এইসকল যুক্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক 'dogma'-কে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে নরনারী স্বতঃই কুণ্ঠা বোধ করছিল। যুগোপযোগী ধর্ম্মের কথা শুনতে না পেয়ে কোটি কোটি মানুষ দারুণতম নৈরাশ্যে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছিল। আবার অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক সত্যের আঘাতে চার্চ্চের ধর্ম্মও খান্ খান্ হয়ে পড়ছিল। সকলেই সেদিন মনে মনে ভাবতে সুরু করলো যে ধর্ম্ম সত্যই মানুষের বিবেক ও ব্যক্তিত্বকে পিষ্ট করে—কুসংস্কারের বোঝা বাড়িয়ে মানুষের আত্মবিকাশের পরিবর্ত্তে আত্মবিলোপই ঘটায়। ঠিক এমন সময় বেদান্তের উদার বাণী দূর দিগন্তের পার থেকে তাদের কানে ভেসে এলো। ভারতীয় দুই বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠ থেকে উৎসারিত বেদান্তের বিপুল জয়গানের মধ্যে আমেরিকাবাসী খুঁজে পেলো বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। তাঁরা প্রচার করলেন দিকে দিকে যে, আসলে যা ধর্ম্ম তা যুক্তি,

বিচার, দর্শন ও বিজ্ঞানের অটল ও অভ্রভেদী ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ; যা ধর্ম্মতন্ত্র তাতেই যুক্তিহীনতা, অন্ধবিশ্বাস আর মিথ্যা প্রাণহীন আচারের প্রাচুর্য্য ! তাঁদের মুখ থেকে যখন তারা শুনলো, "Wherever there is a triumph of science, there is the triumph of Vedanta", তখন তারা সত্যই চম্‌কে উঠেছিল ! যুগ যুগ ধরে আমেরিকাবাসী যাঁর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল–ঠিক তারই সন্ধান পেলো ভারতীয় সন্ন্যাসীদ্বয়ের বাণীর মধ্যে ! স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ আমেরিকায় যে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিলেন, তার মূল কারণ এখানেই ! বিবেকানন্দই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকাবাসীকে নবধর্ম্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—তাকে হাত ধরে নূতন পথে চল্‌তেও শেখাতে লাগলেন। কিন্তু কি জানি বিধাতার কোন এক দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায়ে এই বীর সন্ন্যাসীকে এক নূতন জগতের আহ্বানে অতি শীঘ্রই সাড়া দিতে হলো। তখন তাঁর এই পরিত্যক্ত বিপুল কর্ম্মভার সানন্দে মাথায় তুলে নিলেন তাঁরই গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। সে সময় থেকে আরম্ভ করে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর মুখে আমেরিকা সাগ্রহে বেদান্তবাণী শ্রবণ করলো ! তিনি যে ধর্ম্ম মানুষের কানে শোনালেন তা উদার উন্মুক্ত নীলাকাশের ন্যায়ই বিশ্বজনীন। তাঁর 'Why the Hindus accept Christ and reject Churchanity' 'Scientific Basis of Religion', "Religion of the Twentieth Century" প্রভৃতি মৌলিক চিন্তাপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যাযুক্ত বক্তৃতা আমেরিকার নরনারীকে তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করলো। স্বামিজী সত্যোপাসনার উপরেই সব থেকে বেশী জোর দিতেন। তাই তাঁর মুখে শুনি, "Keep your mind open to Truth with a recepient attitude and a firm faith that it shall come to you" অর্থাৎ সত্যকে লাভ করবো এই দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হয়ে চিত্তকে সর্ব্বদাই সত্যের দিকে উন্মুক্ত করে রাখ। "Spiritual unfoldment'-এর মধ্যে নিহিত যে সত্য তা চিরদিনই দেশ ও কালের ক্ষুদ্র প্রাচীর লঙ্ঘন করে বেঁচে থাকবে। যতদিন মানুষ সত্যলাভের জন্য সাধনারত ও সংগ্রামরত থাকবে, ততদিন ঐ বাণী সাধকের মনে অফুরন্ত প্রেরণাই দেবে। সেখানে ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে স্বামিজী কি জোরের সঙ্গেই না মানুষকে বলেছেন, "Whether we believe in God or not, whether we have faith in any prophet or not, if we have self-control, concentration, truthfulness and disinterested love for all, then we are on the way to spiritual perfection. On the contrary, if one believes in God or in a creed and does not possess these four, he is no more spiritual than an ordinary man of the world, In fact, his belief is only a verbal one"* (অর্থাৎ আমরা ভগবানে বিশ্বাসী

* Spiritual Unfoldment—Page. 73

হই বা না হই, কোন অবতার পুরুষে আমাদের আস্থা থাকুক, বা নাই থাকুক্, যদি আত্মসংযম, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে, তবেই আমরা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী; পক্ষান্তরে যদি কোন মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করা ও আচার নিয়ম মানা সত্ত্বেও এই সকল চতুর্বিধ গুণকে আয়ত্ত করতে প্রয়াস না পায়—তবে সে একজন সাংসারিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের চেয়ে মোটেই আধ্যাত্মিকপথে উন্নত নয়। আসলে এরূপ মানুষের ভগবদ্বিশ্বাস একান্তই মৌখিক।) এই বাণী কি কোনদিনও দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হতে পারে?

স্বামিজী যুক্তি, বিচারের উপর খুব বেশী জোর দিলেও ধর্ম্মজীবনে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা কোনদিনই অস্বীকার করেন নি। তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিল। সেইজন্যই তাঁর পক্ষে অগণিত নরনারীকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল! তাঁর 'Relation of Soul to God' বক্তৃতা শুনে Atlanta Psychological Society-র সভাপতি যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করেই বলি,—"The Subject was 'the Relation of Soul to God', and was treated in a masterly way from both a scientific and metaphysical standpoint, and satisfying both mind and heart, proving conclusively that all science leads to God".

"স্বামিজীর ধর্মপ্রচারে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি

খৃষ্টানকে কখনো হিন্দু হতে বলতেন না। তিনি খৃষ্টানকে সর্ব্বদাই খাঁটি খৃষ্টান হতে উপদেশ দিতেন এবং সর্ব্বদাই তাকে তার আদর্শানুযায়ী সাহায্য করতেও প্রস্তুত থাকতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান, স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা ছিলেন বলেই স্বামিজীর মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব নিরপেক্ষতা ও উদারতা স্থান পেয়েছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত "For the Union of All who Love in the service of All who suffer" নামক এক পুস্তিকায় পাই স্বামিজী গ্রন্থকার Christian Genin Kelley-কে এক পত্রে লিখেছেন, "Go onward like a brave Christian soldier, hold the cross in your hands and stop not until the goal is reached" অর্থাৎ বীর সৈনিকের মতো খৃষ্টের আদর্শ সামনে রেখে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও এবং যতদিন না লক্ষ্যে উপনীত হও, ততদিন তোমার চলা যেন বন্ধ না হয়। স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে আমেরিকা ও ইউরোপের বহু নরনারীই "better Christians"-এ পরিণত হয়েছিল! ক্রাইষ্টকে যথার্থ ভাবে বুঝতে গেলে বেদান্তের মধ্য দিয়েই বুঝতে হয়। একথা স্বামিজী বহুবার বলেছেন! বেদান্তের মধ্য দিয়ে তাই তিনি Christ-কে খ্রীষ্টান জগতে প্রচার করেছেন এবং অগণিত নরনারীকে ক্রাইষ্টের উপদেশও জীবনের নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করে শান্তিদান করেছেন। "The greatest depths of Christ's acts and the fullest, richest meaning of His words have been revealed to me by the teachings of

Vedanta, as expounded by the Swami Abhedananda"—এ শুধু Christian Genin Kelley-র কথাই নয় হাজার হাজার লোকের এই একই কথা। স্বামিজীর ধর্ম্মব্যাখ্যা যে কত চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবান ছিল, প্রচার কার্য্যে তিনি যে কি বিপুল জয়লাভ করেছিলেন, তা প্রমাণের জন্য রাশি রাশি মতামত উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বাড়াতে চাই না।

আমেরিকাবাসীর ধর্ম্ম জীবনে বেদান্তের প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের পর যথার্থভাবে বলতে গেলে স্বামী অভেদানন্দই ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের প্রচারিত শিক্ষার ফলে আমেরিকান নরনারীর উপর চার্চ্চের প্রাধান্য তো অনেকস্থানেই অপসারিত হয়ে গেছে; শুধু তাই নয় চার্চ্চের যাজকেরাও অনেকক্ষেত্রে বেদান্তের নীতিগুলি গ্রহণ করেছে! বর্ত্তমানে আমেরিকায় New Thought, Christian Science, Spiritualistic প্রভৃতি যে সকল আন্দোলন দেখা যায়, সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের শিক্ষার দ্বারাই প্রভাবান্বিত। এই সকল আন্দোলনের বহু বিখ্যাত নেতা অনেক সময়ই স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের বক্তৃতাসভায় যোগদান করতেন। পূর্ব্বে লোকেরা "personal Christ"-এ বিশ্বাস করতো, এখন তৎপরিবর্ত্তে তারা 'Christ principle'-এ বিশ্বাসী। চিন্তাশীল মনীষিগণ আজ ক্রাইষ্টের রক্তদ্বারা পাপস্খালনের বাণীতে .বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। হাজার হাজার মানুষ আজ আর 'hell-fire doctrine'-এ বা 'eternal perdition'-এ ও বিশ্বাস

করে না। ভারতের এই দুইজন নির্ভীকহৃদয় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-প্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যা ফল তা এবার উল্লেখ করি। ঐতিহাসিকের অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা আমেরিকাবাসীদের বুঝিয়ে দেন যে ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ কি! ফলে আমেরিকার অধিবাসীরা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে শিখ্‌লো! আজ রামকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করে যারা বিদেশে গিয়ে বিদেশীর সম্মান ও ভক্তি পাচ্ছেন, আজ যে রামকৃষ্ণ মিশনের চরণতলে হাজার হাজার পাশ্চাত্যের নরনারী শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সমর্পণ করছেন—তার পেছনে রয়েছে এই দুইজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর বিশাল অবদান। ভারতের ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসের এই দুইজন মহামানব একটি বিশিষ্ট যুগের অবতারণা করেছেন। তাই তাঁরা চিরদিনই আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়।

স্বামী বিবেকানন্দের পর স্বামী অভেদানন্দ প্রায় পঁচিশ বৎসর পাশ্চাত্যজগতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করেন। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যজগতে বেদান্তের যে বীজ বপন করেন, তা প্রধানত অভেদানন্দের অবিশ্রান্ত সাধনার ফলে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে শত শত শাখা-প্রশাখযুক্ত বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের শিষ্যবৃন্দ মিলিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের যে জীবনচরিত লেখেন—তার একজায়গায় আছে, "Since the arrival of the Swami Abhedananda in Newyork on 6th August (1897), the interest in

the Vedanta Philosophy received a new impetus···He created a respect for his teachings and enlisted such adherents as would not be convinced unless shown that Huxley, Tyndal, or spencer, or Kant agreed in substance with a particular view advanced by the Vedanta. The seeds shown by Swami Vivekananda on the American soil went on ever growing vigorously as days passed, striking their roots deep into the heart of the nation."* অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেন ; তাঁর আগমনের পরই বেদান্তানুরাগিগণ এক নূতন প্রেরণা পেলো। তিনি এমনভাবে শিক্ষাদান করতেন যে সকলেই তাতে শ্রদ্ধান্বিত হতে লাগলো। সে সব লোক হাক্স্‌লি, টিনড্যাল স্পেনসার ও কাণ্টের সমর্থনবিহীন বেদান্তের কোন মতই গ্রহণ করবেনা, এমন মানুষও তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিত্তভূমিতে বেদান্তের যে বীজ বপন করে এসেছিলেন, তা অতি তাড়াতাড়ি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো এবং তার শিকরগুলিও ক্রমশঃ গভীরতরভাবে জাতির চিত্ত ভূমিতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলো।···············মাদ্রাজে Natesan Co. থেকে প্রকাশিত "The Mission of our

* The Life of Swami Vivekananda—by His Eastern and Western Disciples—The Semi-Centenary Birthday Memorial Edition (1915).

Master" * নামক বিখ্যাত পুস্তকে অভেদানন্দের পাশ্চাত্য-জগতের প্রচার কার্য্যের বর্ণনা করতে করতে একজায়গায় জ্বলন্ত ভাষায় লেখা আছে,—"The Swami (Abhedananda) proved himself not only an able and efficient teacher, but furthered the success of the work in every other way, by his remarkable organising power, sound judgment and consideration, careful attention to the needs of the society to the minutest details, and by his power of adaptability to Western methods of work and teaching......... Suffice it to say that it was greatly due to his untiring perseverance and faithfulness that the message of Vedanta steadily spread into broader fields and gained a firmer foothold in the lives of many American students. Under his able control and management, the work of organisation was fully accomplished, and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church." অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের পর স্বামী অভেদানন্দ শুধু একজন সুযোগ্য ধর্ম্মাচার্য্যই

* The Mission of our Master—Page 458-460.

ছিলেন না—অধিকন্তু বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক আরব্ধ কর্ম্মকে তিনি সর্ব্বতোভাবেই সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর ঐ সাফল্যের পেছনে ছিল তাঁর অপূর্ব্ব সংগঠনীশক্তি, অভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি, সমিতির সামান্যতম প্রয়োজনের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা ও কর্ম্ম পদ্ধতি নিজের করে গ্রহণ করবার বিশেষ ক্ষমতা। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে প্রধানতঃ তাঁরই অক্লান্ত অধ্যবসায় ও আদর্শজনিত অবিচলিত বিশ্বাসের ফলে বেদান্তবাণী অতিশীঘ্র প্রসারিত হয়ে গেলো এবং বহু আমেরিকান শিক্ষার্থীর জীবনে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করলো। তাঁর সুনিপুণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে বেদান্ত সমিতির সংগঠনকার্য্য পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও খ্রীষ্টানধর্ম্মযাজকও নিউইয়র্কের বেদান্তসমিতিকে একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সোসাইটিরূপে গণ্য করতে লাগলো।

যাই হোক বিপুল সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা রামকৃষ্ণমিশনকে পাশ্চাত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর স্বামিজী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আসবার সঙ্কল্প করলেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে সানফ্রানসিস্কো (Sanfransisco) বেদান্ত আশ্রমের পক্ষ থেকে তাঁকে এক বিশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সেখানকার আশ্রমবাসীদের বিদায় সম্ভাষণের প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে স্বামিজীর প্রতি তাদের সুগভীর ভক্তি ও ভালবাসার সুর। তাঁর ভারতাগমনের বার্ত্তা শুনে বেদান্তানুরাগী প্রত্যেক নরনারীর প্রাণই ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠেছিল। যিনি

পঁচিশ বৎসরকাল তাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিপুল প্রেরণা দিয়েছেন—যিনি তাদের জন্মমৃত্যুর রহস্যভেদের সন্ধান দিয়েছিলেন, যাঁকে লোকেরা তাদের ধর্ম্মগুরু (Spiritual Teacher and loving Master) রূপে শ্রদ্ধা করতো—তাঁর বিরহে সেই সকল নরনারীর প্রাণে যে প্রবল দুঃখ ও বেদনার সঞ্চার হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণই নেই। আশ্রমবাসীরা সেদিন বিদায় সম্ভাষণের মধ্যে বেদনাভরা সুরে বলেছিল,—"We, the Members of the Vedanta Ashram, now come to you in a spirit of sadness and reluctance to offer you this farewell expression of our deep love, gratitude and sincere devotion অর্থাৎ আজ আমরা (বেদান্ত আশ্রমের সভ্যগণ) আপনার গুণমুগ্ধ ও প্রীতিভাজনগণ নিরতিশয় দুঃখ-বেদনা ও অনিচ্ছার ভেতর দিয়েই আপনাকে সশ্রদ্ধ বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

তারা সেদিন কেন স্বামী অভেদানন্দকে বিদায় দেবার সময় এমন দুঃখ ও বিরহব্যথা অনুভব করেছিল, তার কারণ পরে তারাই আবার বলেছে,—"Although there are many teachers amongst us, still we have not found another like you who has such a vast treasure of wisdom .and such a deep spiritual realization and who has the power to awaken the Divine consciousness in the earnest souls of seekers after

Truth. Therefore we feel that in your absence we shall be sailing on troubled waters in a ship without her captain, and cannot bear the thought that you would leave us as soon and go to India" —আপনার ভিতরেই কেবল আমরা দেখেছি জ্ঞানের বিরাট আধার আর আধ্যাত্মিকতার প্রবল অনুভূতি; সত্যান্বেষীদের অন্তরে আপনিই জাগিয়েছেন আধ্যাত্মিক প্রেরণা। তাই যদিও আমাদের ভেতর এখনও আরও অনেক ধর্ম্মগুরু আছেন, তবুও আপনাকে বিদায় দিতে প্রাণে ব্যথা অনুভব করছি। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে আপনার অভাবে আমাদের অবস্থা হবে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়; তাই আপনি যে আমাদের এত শীঘ্র ছেড়ে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করবেন—তা ভাবতেই পারছি না।

যাইহোক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী সানফ্র্যানসিস্কো থেকে ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন। আসবার পথেও তিনি জ্ঞানের বিচিত্র বিভাগ থেকে নব নব জিনিষ শিক্ষা করলেন। সে সময় "Pan-Pacific Educational Conference-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে গমন করেন ও সেখানে বক্তৃতাও প্রদান করেন।* তারপর জাপান, চীন, ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালা-লামপুর, রেঙ্গুন প্রভৃতি সহরে ভারতের আর্য্যসংস্কৃতি ও

* Contemporary Indian Philosophy—See Abhedananda's "Biographical."

সভ্যতার বাণী প্রচার করতে করতে ঐ বৎসরেরই শেষভাগে কলিকাতায় এসে পৌঁছান।

এখন স্বামিজীর বয়স প্রায় ৫৬।৫৭ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কর্ম্মশক্তি, তেজস্বিতা, জ্ঞানস্পৃহা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। ইউলিসিসের (Ulysses) মধ্যে আমরা যে অজানা ও নূতনকে জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছি, সেই সত্যিকারের পাগলকরা জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা স্বামিজীর মধ্যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে—কোন সময়ই তার মধ্যে আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা স্থান পায়নি।

"To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bound of human thought"

জ্ঞানের পথে চলার এই বিপুল সুর কি তাঁর লেখার মধ্যে ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠে নি? মানুষের মধ্যে রয়েছে অজানাকে জানার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। তাই দেখি পাশ্চাত্য-দেশে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে না করতেই আর এক নব আহ্বানের প্রেরণায় তিনি আবার পর্য্যটনে বের হলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামিজী রাশিয়ার বিখ্যাত পর্য্যটক Dr. Notovitch-এর "The Unknown Life of Jesus" পাঠ করেন; ঐ গ্রন্থের লেখক তিব্বত ভ্রমণ করতে আসেন এবং সেখানকার 'হিমিস মঠে' উপস্থিত হয়ে লামাদের মুখে শুনলেন যে যীশুখ্রীষ্ট ভারতে ও তিব্বতে এসেছিলেন। Dr. Notovitch-কে তখন লামারা

এ বিষয়ের উপর লিখিত একখানি গ্রন্থ দেখান; তিনি তখন লামাদের সাহায্যে উহার ইংরাজী অনুবাদ করে ফেলেন এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে "Unknown Life of Jesus লেখেন। Dr. Notovitch-এর বর্ণনার মধ্যে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য ছিল তা পরীক্ষা করবার ইচ্ছা সে সময়েই স্বামিজীর মনে জাগে। এই জানার আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি ভারতে পদার্পণ করার ঠিক পরেই তিব্বত ভ্রমণে বহির্গত হন। কাননকান্তার ও পর্ব্বত বতিক্রম করে তাঁর চলা সুরু হলো। নানা দুঃখকষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর চলা অপ্রতিহতই রইলো; পাঞ্জাব, কাশ্মীরের নানা স্থান পর্য্যটন করতে করতে অবশেষে তিব্বতের সেই বিখ্যাত 'হিমিস মঠে' এসে পৌঁছালেন। সত্য ও জ্ঞানলাভের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম সহিষ্ণুতা ও অত্যুগ্র সাধনার যে কাহিনী—যা আমরা "পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ" গ্রন্থে পাই—তা সত্যই আমাদের চিত্তকে বিস্ময়ে ও পুলকে আন্দোলিত করে দেয়। ইউলিসিসের কাহিনী পড়তে পড়তে যেমন পাঠকের মনে একটা spirit of adventure জেগে উঠে —সেইরূপ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দের যে রোমাঞ্চকর কাহিনী তাও আমাদের মনকে পথে চলার আহ্বানে পাগল করে তোলে। "স্বামিজী এই মঠের লামার নিকট সন্ধান করিয়া জনিলেন যে ঐ বিষয়টি (অর্থাৎ Dr. Norovitch-এর তথায় আগমন) সত্য। যে পুস্তকে ঐ বিষয় লিখিত রহিয়াছে তাহা স্বামিজী দেখিতে চাহিলেন। যে লামা স্বামিজীকে সমস্ত

দেখাইতেছিলেন, তিনি একখানি পুঁথি তাক হইতে পাড়িয়া স্বামিজীকে দেখাইলেন এবং বলিলেন এইখানি নকল পুঁথি। আসলখানি লাসার নিকটবর্ত্তী "মারবুর নামক স্থানের মঠে আছে। উহা পালি ভাষায় লিখিত কিন্তু এইখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। ইহা ১৪টি পরিচ্ছেদ ও ২৪৪টি শ্লোকযুক্ত। স্বামিজী তাঁহার সাহায্যে ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া লইলেন।"* স্বামিজী যা অনুবাদ করে নিলেন তা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে স্বামিজী যীশু-খ্রীষ্টের ভারতাগমনের কথা প্রমাণের জন্য অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন! সেগুলি খুবই বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে কত বেশী ও তার কারণই বা কি—এই সকল বিষয় নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙালা ভাষায় ভ্রমণমূলক গ্রন্থ অনেক থাকলেও এরকম ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ খুব কমই আছে। তিব্বতে স্বামিজী কিছুকাল অবস্থানের পরই আবার তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করতে স্থরু করলেন। তিব্বত থেকে তিনি পেশোয়ার ও কাবুল নদীর ধার দিয়ে দিয়ে পশ্চিম ভারতের প্রত্যন্তসীমা পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন। তারপর তিনি পাঞ্জাবে উপস্থিত হলে বহুলোকের অনুরোধে তিনি সেখানকার বিখ্যাত ফোরম্যান ক্রীশ্চান্স কলেজে (Foreman's Christian College) কর্ম্মযোগ (Philosophy of Work) সম্বন্ধে এক সারগর্ভ ইংরাজী বক্তৃতা ওজস্বিনীভাষায় প্রদান করেন। সেই

* পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ (২৮২-২৮৯)

সভায় পৌরহিত্য করেন ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ লাকাস। সভাপতি মহাশয় জাতিতে আমেরিকান ছিলেন। ঐ সভায় ভীড়ও হয়েছিল অতিরিক্ত বেশী। ধ্যানলব্ধ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিকের মুখে কর্ম্মযোগের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির অতি প্রাঞ্জলভাষায় অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করে কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলেই বিপুল বিস্ময়ে মোহিত হয়ে যায়। সভাপতি অধ্যক্ষ লাকাস (Principal Lucus) স্বামিজীর বক্তৃতায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সভায় বক্তৃতা করতে উঠে তিনি সানন্দে বললেন,—"আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক এবং সারাজীবন এই বিষয় লইয়াই আছি, কিন্তু এই শিক্ষিত স্বামিজী (The learned Swami) আজ যা বলিলেন এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আমি আর কোথাও শুনি নাই। আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিখ্যাত লোকদের বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু আজ আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, ভারতে এঁর তুল্য বক্তা কেহ নাই। আমি যখন নিউইয়র্কে ছিলাম তখন স্বামিজীর নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আজ আমি শুনিয়া ধন্য হইলাম"।* প্রত্যাবর্ত্তনের পথেও এইভাবে তাঁকে স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করতে হয়েছিল। অবশেষে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন! এখন থেকে তাঁর জীবনে আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হলো।

* পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ—৩০৭ পৃষ্ঠা

স্বামী অভেদানন্দের শেষ জীবন

চতুর্থ অধ্যায়

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা

বেলুড় মঠে কিছুদিন অবস্থানের পর স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতায় আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ বহুবার পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামিজীকে বলেছেন যে, "আমার বড় ইচ্ছা কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আমাদের সকল গুরুভাইদের লীলাস্থলও কলিকাতায়। আমি যদি না পারি তবে তোমরা এ কাজ কর।" স্বামী বিবেকানন্দের ঐ কথা স্বামিজী কোনদিনও ভুলতে পারেন নি। তাই ভারতবর্ষে আসার পরই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুযায়ী কলিকাতায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটী প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। এই সময় কলিকাতাবাসীদের আশাতীত সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হতে লাগলেন। নানা জায়গা থেকে নূতন নূতন লোক এসে এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই গুণমুগ্ধ কলিকাতাবাসীদের আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামিজী "রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্বামী বেদানন্দ লিখিত প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে,—"রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি প্রথমে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত

ছিল। স্বামী অভেদানন্দ দারুণ গ্রীষ্মের সময় ব্যতীত আর সকল সময় কলিকাতায় থাকিয়া বুধবার, শনিবার ও রবিবারে যথাক্রমে রাজযোগ, গীতা ও বেদান্তের ক্লাস করিতেন। তাঁহার বিচিত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি-উৎসারিত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সে সময় শুধু সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণই নয় পরন্তু বহু বিখ্যাত অধ্যাপক ও সুধীব্যক্তির সমাবেশে সমিতির হল ও পাশের দুইটি ঘরে ভয়ানক জনতা হইত। ইহা ছাড়া তাঁহাকে আবার অনেক প্রসিদ্ধ জনসভায় সভাপতি ও মূল বক্তারূপে বক্তৃতা করিতে হইত। এই সময়েই তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৃপাশরণ মহাস্থবির, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কলিকাতার লর্ডবিশপ মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বিশিষ্ট বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন।”

তারপর স্বামিজী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হাতীবাগান পল্লীতে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির স্থায়ীভবনের জন্য জমি ক্রয় করেন এবং উহার গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যও সুরু হয়। এই সময় অনেকেই তীব্র প্রতিকূলতা বিস্তার করে তাঁর মহান উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। আদর্শে অবিচলিত শ্রদ্ধা ও চরম জয়লাভে পূর্ণ সচেতন না থাকলে মানুষ কখনো এমন প্রতিকূলতার মধ্যে কার্য্য সম্পাদন করতে পারে না। জগতে যারা বড় হয়েছেন, তারা প্রচণ্ডতম দুঃখ ও আঘাতের মধ্যদিয়েই বড় হয়েছেন। এই অনন্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বামিজীর ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের অভাব কখনও ঘটে নি। এই সময়ও তিনি সর্ব্বদাই

বলতেন—এ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে ঠাকুর ও স্বামিজীর ইচ্ছা—তাঁদের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে জগতে এমন কোন শক্তিই নেই। এই আশ্রম কোনদিনও ভাঙ্‌বার নয়—ধীরে ধীরে বড় হয়ে পরিশেষে বিশ্বমানবের মিলনতীর্থে পরিণত হবে। যাই হোক বেদান্তসমিতির মন্দির নির্ম্মাণ ছয় বৎসর পরেই শেষ হলো এবং রামকৃষ্ণদেবের শততম জন্মদিবসে স্বামিজী উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল হল নির্ম্মাণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই স্বামিজী দার্জ্জিলিং সহরেও একটি আশ্রম স্থাপিত করেন। আশ্রমের স্থায়ী বাড়ী নির্ম্মিত হবার বহু পূর্ব্বেই তাঁর প্রিয় শিষ্যগণের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর উৎসাহে কলিকাতায় ও দার্জ্জিলিং‌এ দুইটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—তাদের কার্য্য আজও সফলতার সঙ্গেই চল্‌ছে। স্বামিজী এই সময় "বিশ্ববাণী" নামে একটী উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। আজও তা গৌরবের সঙ্গে বিশ্বধর্ম্ম-মিলনের বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করছে। কলিকাতায় বা দার্জ্জিলিং‌এ স্বামিজী যখনই যেখানে থাকতেন, ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত সুধী, পণ্ডিত ও ভক্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। মহাত্মা গান্ধী, জগদীশ বসু, স্যার পি, সি রায়, স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, স্যার সি, ভি র‍্যামন্, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষী ও জননায়কগণ স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। বাঙলাদেশের বাইরে থেকেও অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো।

সকলকেই স্বামিজী প্রথম অভিভাষণেই মুগ্ধ করে ফেলতেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বা নিরক্ষর চাষী—কেউই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে কোনদিনও নৈরাশ্যভরা কাঙালনয়নে ফিরে যায় নি। এমন কি যারা তাঁকে নিদারুণরূপে আঘাত করেছে, তাদের প্রতিও স্বামিজীর ভালবাসা ছিল যে কত সীমাহীন—তা প্রত্যক্ষ না দেখলে মানুষ কখনো বিশ্বাস করতে পারে না। মহামানবতার জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন বলেই মানুষকে কখনো তিনি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করতে পারেন নি; তাঁর কাছে প্রত্যেক মানুষটিই যে ছিল—"living image of God"—ভগবানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

যারা এ মানুষটির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন তারাই জানেন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর কি অসীম ভালবাসা ছিল। গীতায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের যে সোণার আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, তা যে জীবনে কোনদিনও সম্ভব তা তাঁকে দেখে মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। বড় বড় কাজের কথা ছেড়ে দিয়েও, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কর্ম্মগুলি যারা লক্ষ্য করেছেন তারাই দেখেছেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তিনি কিভাবে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই বলতেন,—"আমার কাজ শেষ হয়েছে, সব ঠাকুরকে দিয়েছি; এখন ঠাকুরই সব চালাবেন।" নিষ্কামকর্ম্মের আদর্শ তিনি নিজের জীবন দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। গীতার আদর্শ তাঁর জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং গীতার

শিক্ষাই তাঁর বজ্রকণ্ঠে বার বার নিনাদিত হয়েছিল।* যারা বলে থাকে যে Absolute Truth বলে কিছুই নেই—তারা স্বামিজীর জ্ঞানময় মূর্ত্তির দিকে তাকালেই তাদের ভুল বুঝতে পারবেন। এরকম সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ আজকাল-কার এ ধর্ম্মবণিকতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার যুগে প্রকৃতই বিরল।

পৃথিবীর ইতিহাসে যারা অতিমানব বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন, তাদের সকলের জীবনেই নিন্দা ও আঘাত এসে থাকে। সক্রেটিস বা ক্রাইষ্ট, মহম্মদ বা চৈতন্য সকলের জীবনই এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। যাঁরা বড়—সাধারণ মানুষ থেকে—তাঁদের পার্থক্য কোথায়? সংসারে এমন কোন লোকই নেই যার উপরে দুঃখ, আঘাত ও নিন্দা এসে পড়ে নি। সাধারণ মানুষ সেই দুঃখ ও নিন্দার প্রচণ্ড আঘাতে অধীর ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু বড় যারা তারাই কেবল দুঃখ, নিন্দা ও অপমানে বিচলিত না হয়ে অটলোন্নত শিরে অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় অতুলনীয় গাম্ভীর্য্যে দাঁড়িয়ে থাকেন মহাকালের বুকে।

সক্রেটিস ও ক্রাইস্ট, মহম্মদ ও চৈতন্যকে আমরা শ্রদ্ধা করি কেন? কারণ হচ্ছে তাঁরা যে মহান আদর্শ প্রচারে ব্রতী ছিলেন—অপরিসীম দুঃখ ও অনন্ত বিঘ্নের সামনেও তা বিসর্জ্জন দেন নি। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েই তাঁরা সে আদর্শের বিপুল মহিমা ঘোষণা করেছেন। তাই মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে

* যেদিন থেকে আমাদের দেশ গীতাকে ত্যাগ করেছে সেদিন থেকে তার পতন সুরু হয়েছে। 'যেমন শুনিয়াছি' পৃঃ ৬

থাকেন—পরপার থেকে তাদের বাণী ভেসে আসে পৃথিবীর দিকে দিকে। এইরকমের একজন অতিমানব ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। বহু লোকে তাঁর নিন্দা করেছে, কুৎসা করেছে—কিন্তু তাঁর মুখের সেই দিব্য হাসিকে কেউই কোন দিন ম্লান করতে পারে নি। নিজের অধ্যাত্মভাবে তিনি এতই বিভোর থাকতেন যে পার্থিব নিন্দা ও প্রশংসার 'অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা' লক্ষ্য করবার মত তাঁর অবকাশ ছিল না। স্বামিজী একবার বলেছিলেন, "তুচ্ছম্ ব্রহ্মপদম্"। এই ভাব না থাকলে কি কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে! আমি তো এই ভাব নিয়েই সারা পৃথিবী ঘুরেছি।" বহু ক্ষুদ্রমনা ও হীনচেতা পুরুষ স্বামিজীর জ্ঞানময় ও জ্বলন্ত মূর্ত্তির দিকে তাকাতে না পেরে ও তাঁর উদার ধর্ম্মবাণীর মর্ম্ম (Spirit) বুঝতে না পেরে * অনেক সময়ই তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা মিথ্যাভাবে প্রচার করতো এবং সরল মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবার চেষ্টাও করতো। সে সকল নরনারীকে উদার প্রকৃতি সত্যান্বেষিগণ নিশ্চয়ই বলবেন যে, সহস্র মূষিকের চিৎকারেও গৌরীশৃঙ্গ নড়ে না—প্রবল ঝঞ্ঝার তীব্র আক্রমণ ভেদ করে সে চিরদিনই দাঁড়িয়ে থাকে আপনার ভাস্বর কীর্ত্তি নিয়ে। সঙ্ঘে ও প্রতিষ্ঠানে যখন থেকে সঙ্কীর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তখন থেকেই তার পতন সুরু হয়। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শেই মঠ ও মন্দির প্রাণবান হয়ে উঠে। সেই সকল নিত্য

* His Scholarship was the despair of many—Prabuddha Bharat Oct, 1939.

বুদ্ধ, শুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগণ যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিনই মঠ ও মন্দির থেকে ধর্ম্মের ও জ্ঞানের পুণ্যালোক বিকীর্ণ হয়। তাদের অভাবেই সঙ্ঘে ও সমিতিতে দলগত ভাব প্রবেশ লাভ করে—ক্ষণে ক্ষণে লোকলোচনের অন্তরালে মঠ ও প্রতিষ্ঠানকে জীর্ণ করে ফেলে। মহাপুরুষেরা জ্ঞান, বৈরাগ্য, আত্ম-সংযম, উদারতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী—সেইহেতু তাঁরা চিরদিনই শ্রদ্ধার ভাজন - কিন্তু দলগত ভাব ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি চিরকালই নিন্দনীয়। যে সকল মানুষ মনে করে যে তাদের গুরুপ্রচারিত সত্যই একমাত্র সত্য-- যারা একজনকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে অপরকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না—তারা নিতান্তই ক্ষুদ্রমনা ও ভ্রান্ত। যারা মনে করে অপর কোন মহামানবের প্রশংসা করলে তাদের গুরুর মহিমা হ্রাস পায়, আসলে মূর্খ তো তারাই। তাদের কাছে আমরা শুধু এটুকুই বলতে চাই যে একজনকে বড় করবার জন্য অপর আর একজনকে ছোট করবার কোন প্রয়োজনই হয় না। মহাপুরুষদের প্রত্যেকেই নিজের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে অতুলনীয় গৌরব নিয়ে বর্ত্তমান থাকেন। তথাকথিত ভক্তগণ উদার প্রকৃতি গুরুকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণতার মনোবৃত্তির দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করে—তাতে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তারা গুরুকে অশ্রদ্ধাই করে থাকে। তারা গুরুর দেহাবসানের পর সঙ্কীর্ণতা দ্বারা নিজেদের একটা গণ্ডী করে নেয়—সেই গণ্ডীর মধ্যে যা কিছু সমস্তেরই জয়ধ্বনি তাদের কণ্ঠে—সেই গণ্ডীর বাইরে যা কিছু সবই তাদের নিকট তখন তুচ্ছ হয়ে যায়—নিজেদের তিলে

তিলে আত্মবিলোপের পথে টেনে নেয়। তাই তারা ইতিহাসে কোন দিনও ক্ষমা পায় না। ধর্ম্মজগতে সমস্ত ভেদাভেদ, অনর্থ ও অমঙ্গলের জন্য দায়ী এই সব সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নরনারী। আজ সময়ে এসেছে যখন রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের জীবনালোকে ধর্ম্মজীবন গঠন করতে হবে। তাঁদের মধ্যে ছিল সর্ব্বজনীন ভাব ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মহান্ আদর্শ। আজ নরনারী যদি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীদের উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করতে পারে, তবেই হানাহানি, ষড়যন্ত্র, মারামারি, কলহ ও বৈষম্য ধর্ম্মজগত থেকে দূর হতে পারে। যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ধর্ম্মজগতে বর্ত্তমান বৈষম্য, ভেদাভেদ ও কলহের মূল কারণগুলি সন্ধান করবার একান্তই প্রয়োজন। সেইজন্যই এখানে সেগুলি উত্থাপন করে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম।

বিগত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ রামকৃষ্ণ-ইতিহাসের একটী স্মরণীয় বৎসর। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতার টাউনহলে বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন (Parliament of Religions) আহূত হয়। এই বিরাট সম্মেলনে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে প্রধান প্রধান মনীষি ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত সম্মেলনের দুই অধিবেশনে স্বামী অভেদানন্দকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। Religions of the world (Vols I & II) নামক বিরাট গ্রন্থে এসব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সম্মেলনের মূল সভাপতি

(General President) ছিলেন বিশ্ববরণীয় দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বার্দ্ধক্যজনিত অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রথম দিনের অধিবেশনে তিনি সভায় এসেছিলেন। তাঁর অভিভাষণ পাঠের পর তিনি স্বামী অভেদানন্দকে পৌরহিত্য করতে অনুরোধ করে তিনি সে সভা পরিত্যাগ করেন। সমবেত জনতার বিপুল হর্ষ ও জয়ধ্বনির মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে স্বামিজী সভাপতিরূপে সুললিত স্বরে ও আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। উপসংহারে তিনি সকলের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—"I hope that this Parliament of Religions will sound the death-knell of all communal strife and struggle, and will create a great opportunity for promoting fellowship among various Faiths"—অর্থাৎ আমি আশা করি আজকের এই বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন সকল সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসংবাদের যবনিকা পাত করবে এবং সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে সহায়তা করবে। সভার শেষে শত শত নরনারী তাঁর পদধূলি মাথায় নেবার জন্য তাঁর চরণ দু'খানি নিয়ে কি আগ্রহ সহকারেই না কাড়াকাড়ি করেছিল। সেদিন স্বামিজীর বক্তৃতা সমবেত জনতা স্তব্ধ হয়ে অতি বিস্ময়ে শ্রবণ করেছিল। তারপর পরদিবসের বৈকালের অধিবেশনেও তিনি আবার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিবসে বক্তৃতায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ এ যুগে কত প্রয়োজন তা সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এই বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনের বিবরণ ও ঘটনা পাঠ করলে আমরা

যথার্থই বুঝতে পারি যে স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী কি সাফল্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণের বাণী বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করেছেন।

এই বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনই স্বামিজীর ছিল প্রকাশ্যসভায় শেষ বক্তৃতা। এর পর থেকেই স্বামিজীর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দার্জ্জিলিং থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে ট্রেন দুর্ঘটনায় তাঁর হৃদযন্ত্রে আঘাত লাগে। এই ট্রেনদুর্ঘটনার পর হতেই তাঁর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হতে আরম্ভ করে। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শোথ রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু এসময়ও তাঁর কর্ম্মবিরতি ছিল না। এই অবস্থায়ও শত শত নরনারী প্রত্যহ তাঁর অযাচিত করুণালাভ করে ধন্য হয়েছে। মনের উদ্যম, শক্তি, সাহস ও সংগ্রামলিপ্সা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছি। ভীরুতা ও ক্লীবতাকে তিনি কোন দিনই ক্ষমা করেন নি। প্রচণ্ড কর্ম্ম-শক্তি তাঁর সমস্ত জীবনেই পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে এই অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর শত শত অপ্রকাশিত বক্তৃতা সংশোধনা করে দিতেন। এই সময়ও তিনি প্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্য-দের রাত্রি একটা দুটো পর্য্যন্ত সাধনভজন সম্বন্ধে নানাবিষয় শিক্ষা দিতেন। এইভাবে জীবনের শেষ দিনগুলি কেটে যেতে লাগলো। তারপর এলো ৮ই সেপ্টেম্বরের (১৯৩৯) প্রভাত। এখনও কেউ ধারণা করতে পারে নি যে স্বামিজী আজ ইহজগৎ পরিত্যাগ করবেন। যাই হোক প্রভাতরবি ক্রমশঃই দিবসের দীপ্ত

আকাশে গড়াতে লাগলো। এমন সময় চারিদিক থেকে শোনা যেতে লাগলো স্বামিজী মহাসমাধি লাভ করেছেন। দলে দলে ভক্ত নরনারী এসে আশ্রম প্রাঙ্গন ও গৃহকে পূর্ণ করে তুললো। সেদিন পৃথিবীতে অগণিত ভক্ত নরনারী দুঃসহ বিরহ ব্যথায় কেঁদে উঠলো—উর্দ্ধে প্রকৃতি দেবীও অশ্রুবর্ষণ করে শোক সন্তপ্ত মানব মনে শীতল বারিধারা প্রদান করলো। দূর্ দূরান্তরে বাজতে লাগলো স্বামিজী আর নেই। আশ্রমের যিনি সিংহ ছিলেন—এতদিনে তিনি অন্তর্হিত হলেন—অধ্যাত্মজগতে যিনি বিজয়ী সম্রাট ছিলেন আজ তাঁর অন্তর্ধান ঘট্‌লো। জানি এহেন সন্ন্যাসীর মৃত্যু নেই—কিন্তু তাঁর অপ্রত্যাশিত দেহাবসানে সেদিন সমস্ত নরনারী—সকলেই তাঁর অভ্রভেদী মহত্ত্বকে স্মরণ করে না কেঁদে পারে নি। রাশি রাশি কুসুমের অর্ঘ্য এসে ভক্তগণ তাঁর দেবচরণে সমর্পণ করতে লাগলো। সন্ন্যাসীবৃন্দের 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ', 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে সারা আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। বেলা প্রায় ৫ ঘটিকার সময় বিরাট শোভা যাত্রা করে স্বামিজীকে কাশীপুর বাগানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে এই দেবদেহের সৎকার করা হলো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বত্যাগী ও শেষ সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্তর্ধান এভাবেই ঘটলো। যে একাদশজন সর্ব্বত্যাগী যুবক শিষ্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের হাতে গড়েছিলেন বিশ্বমানবের মঙ্গলার্থে—স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তাদেরই একজন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতা অন্তর্হিত হয়েছিলেন; কেবল জীবিত

ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। আজ তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রজ্বলিত আধ্যাত্মিক দীপালীর শেষ দীপশিখা নির্ব্বাপিত হলো এবং ভারতবর্ষও একজন স্বদেশের মুখোজ্জ্বল-কারী সন্তান হারিয়ে দরিদ্র হলো। তিনি যেভাবে দেহত্যাগ করলেন—জগতে যারা চরম সত্য উপলব্ধি করেছেন—কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম, রামকৃষ্ণ ও চৈতন্য যে সত্যলাভ করেছিলেন—সেই আধ্যাত্মিক সত্যের জ্যোতির্ম্ময় আলোকে তাঁর চিত্তও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। উপনিষদের ঋষিদের মত তিনি সেই তিমিরধ্বংসী ব্রহ্মকে জেনেছিলেন—তাই মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি—মৃত্যুকেই তিনি পরাজিত করেছেন। ধন্য তাঁরাই যাঁদের বাণী পরলোক থেকেও ভেসে আসে ভুবনের ঘাটে ঘাটে—ধন্য তাঁরাই যাঁদের মুখের দিব্য হাসি মৃত্যুর বিবর্ণতার সামনেও অম্লান থাকে। যে সমস্ত মানব এরূপ মহাপুরুষের চরণতলে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন তারাও ধন্য। যে নির্ভীকহৃদয় মৃত্যুভয়হীন পুরুষ সেদিন দেহত্যাগ করলেন, তার সম্বন্ধে দেশবিদেশ বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করেই এ প্রবন্ধ শেষ করি,—

"There were two aspects of the life of Swami Abhedananda, that of a man of learning and a man of religion. The life of the Swami was but a synthesis of the two, He excelled in prophiciency in Vedanta Philosophy ; perhaps in

that branch of learning he had hardly a peer in India. But at the same time, his soul had always thursted for the Truth, the great Truth which had been reflected in the mind of Jajnavalkya, Gautama, Sree Krishna and Sree Ramkrishna. The great joy which springs from the knowledge that the soul is inseparable from the Great Being and is at one with the Universe, from the knowledge that unfolds to humanity the immortality and continuity of life and death to be more shadow on the ephemeral stage in the process, had never lost its lure for Abhedananda. He struggled and struggled until the great Truth dawned upon him, driving away ignorance and egotism, as the evanescent morning mist would fade away before the rising Sun"*— অর্থাৎ স্বামিজীর জীবনের তুটো দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— একটা হলো তাঁর জ্ঞানের দিক আর একটা হলো তাঁর ধর্ম্মের দিক। এই তুইটি বিষয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। বেদান্তদর্শনে তিনি অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়েছেন; বৈদান্তিক হিসাবে তাঁর সমকক্ষ ভারতে আর কেউ নেই বললেই

* Amrita Bazar Patrika, 3 Oct. 1939.

চলে। এখানে সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে, যে সত্য যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মানসে, প্রতিভাত হয়েছিল, সেই সত্যলাভের জন্য স্বামিজীর অন্তর সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। মানবাত্মা সেই বিরাটপুরুষ থেকে ভিন্ন নয় এবং নিখিল বিশ্বের সহিত তার সম্বন্ধ অভিন্ন ; আত্মা অমর ও অবিনশ্বর, মৃত্যু হলো জীবনের পটভূমির উপর ক্ষণস্থায়ী ছায়ামাত্র ; যে জ্ঞানের দ্বারা এ সকল সত্য মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, সেই জ্ঞানসঞ্জাত আনন্দলাভের আকর্ষণ স্বামিজীর মধ্যে চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল। যে পর্য্যন্ত না তিনি সত্যোপলব্ধি করতে পেরেছেন, সে পর্য্যন্ত তার সাধনা ও সংগ্রাম ছিল বিরামহীন ; উদীয়মান সূর্য্যের সামনে যেমন প্রভাতের কুয়াসা অবলুপ্ত হয়, ঠিক তেমনি এই সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর মনের ক্ষণিক অজ্ঞানতা ও অহমিকা অপসারিত হলো।

দার্শনিক অভেদানন্দ

পঞ্চম অধ্যায়

"A noted professor of Columbia University has said that he considers Abhedananda to have the most brilliant philosophical mind to be found anywhere in the world to-day."—Toronto Saturday Night (America).

"Swami Abhedananda excelled in proficiency in Vedanta philosophy ; perhaps in that branch of learning he had hardly a peer in India.

—Dr. Mahendra Nath Sircar.

আধুনিকযুগে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ভারতবাসী বিশ্বজগতে দার্শনিকরূপে পরিচিত হয়েছেন, স্বামী অভেদানন্দ তাঁদের মধ্যে একজন অতি প্রধান। সাধারণ মানুষ তাঁকে প্রধানতঃ একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরূপেই জানে। রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে তিনি পরমহংসদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে পূজিত। পাশ্চাত্যজগতে তিনি শক্তিশালী ধর্ম্মপ্রচারকরূপে সম্মানিত ও বিশ্বের সুধীমহলে দার্শনিকরূপে অভিনন্দিত। চিন্তার অতুলনীয় অবদানে তিনি বিশ্বদর্শনকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর গ্রন্থাবলী জ্ঞানের ও আনন্দের অনন্ত উৎস।

সংস্কৃতে আমরা যে অর্থে 'দার্শনিক' শব্দ ব্যবহার করি, ইংরাজীভাষায় 'Philosopher' শব্দ তা সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণ-

রূপে প্রকাশ করতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানী ও মনস্বী পুরুষমাত্রই 'Philosopher'; কোন মানুষ প্রতিভা ও বুদ্ধির দ্বারা বিশিষ্ট মতবাদ গড়ে তুললেই পাশ্চাত্য তাকে 'Philosopher' বলে। ভারতবর্ষে কিন্তু ঠিক তা নয়। বুদ্ধি ও মনীষা থাকলেও যদি কোন মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করতে না পারে, তবে তাঁকে দার্শনিক বলে অভিনন্দিত করা হয় না। একবার শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরকমেরই উত্তর দেন; সে সময় তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিরাই একমাত্র দার্শনিক।* অপরিণামী অব্যয় সত্যকে যাঁরা ধ্যানলোকে জেনেছেন—ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিতে যাঁরা সেই বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা ও অভিন্নতা (unity and identity) উপলব্ধি করেছেন—ভারতীয় আদর্শানুযায়ী সত্যিকারের দার্শনিক তাঁরাই।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন একজন প্রকৃত দার্শনিক (philosopher-saint)। ভারতের দার্শনিকমাত্রই আধ্যাত্মিক মানব—দিব্যজ্ঞানলব্ধ পুরুষ। মনীষা তো চাই-ই—যুক্তি ও বিচারের প্রয়োজন জীবনে তো আছেই; কিন্তু সেই চরম সত্যকে (Ultimate Reality of the universe) জানার পক্ষে তাই শেষ কথা নয়—সেখানে "আত্মসমাহিত জ্ঞানই" সবচেয়ে বড়

* 'In India, a true philosopher is not a mere speculator, but a spiritual man.—Contemporary Indian Philosophy, P. 57.

কথা। এই জ্ঞানেরই মহিমময় আলোকে স্বামী অভেদানন্দজীর চিত্ত ছিল সমুজ্জল। তথাকথিত দার্শনিক থেকে এখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষ কোন একটা মতবাদকে (theory) প্রচার করবার জন্য দর্শনজগতে তাঁব আবির্ভাব ঘটে নি—তিনি এসেছিলেন পুরাতন অথচ শাশ্বত সত্যের সুমহতী বাণী প্রচারের জন্য। যাঁরা সত্যকে লাভ করেছেন—তাঁদের জীবনে কী কখনো মতবাদ প্রাধান্যলাভ করতে পারে? মতবাদের কোন মূল্য নেই—একথা এদ্বারা বলছি না—মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ততক্ষণই যতক্ষণ সত্যকে সঠিকরূপে জানা না যায়। মতবাদসর্ব্বস্ব মনীষিগণ মানসিক উৎকর্ষকে (intellectual culture) বড় করে দেখেন, কিন্তু স্বামিজী মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও আত্মার উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেই (spiritual realization) সর্ব্বাপেক্ষা বড় বস্তু বলে মনে করেন।

বুদ্ধির বিকাশ ও মানসিক উৎকর্ষের ফলে জীবনযুদ্ধে জয়-লাভের পথ সত্যই প্রশস্ত হয়—প্রকৃতির নব নব গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করে জ্ঞানৈশ্বর্য্যও প্রচুর পরিমাণে বাড়ান যায়—কিন্তু কেবল পাওয়া যায় না তাঁকে—যাঁকে পেলে মানুষ সব কিছুকে জানতে পারে। বুদ্ধি ও মনীষার দ্বারা আর যাই হোক দেশ কাল ও নিমিত্তের পরপারে নিহিত যে মহান সত্য (Truth transcending the plane of time, space and causation), তাঁকে জানা যায় না। এর কারণ স্বামিজীর

ভাষায়—"It (Absolute Truth) is beyond sense-perception, beyond mind and its functions and above thought". * মনের শক্তি তো একান্তই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। অসীম পুরুষকে সামান্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় না—আত্মাকে আত্মার দ্বারাই উপলব্ধি করতে হয়। তাইতো স্বামীজীর মুখে শুনি,—"By spirit spirit can be known. Spirit cannot be known by anything else. God can be known only by God. When a mortal comes face to face with God, he is no longer a mortal. We cannot face the Absolute until we become Absolute"† স্বামিজী তাঁর 'Existence of God' নামক বক্তৃতায় নিজেই এক জায়গায় এ প্রশ্ন তুলে নিজেই আবার উত্তর দিয়েছেন। "How can we know the Supreme Being as the Soul of our souls ? By rising above the plane of consciousness of the finite. This plane of consciousness will never reveal the true nature of the Infinite Being because it functions within the limitations of the senses, consequently it cannot reach the Infinite which is above all limits......If we wish to know God, we shall have

* The Path of Realization—P. 49.

† The Path of Realization—P. 26.

to enter into the state of superconsciousness"*—অর্থাৎ কি ভাবে আমরা সেই পরমপুরুষকে আমাদের পরমাত্মা-রূপে জানতে পারি? সসীম জ্ঞানের ভূমিকে অতিক্রম করেই। বর্ত্তমান জ্ঞানভূমিতে কখনও সেই অনন্তপুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হবে না, কেননা এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যেই একান্তভাবে আবদ্ধ। তাই এই জ্ঞানের দ্বারা অনন্তের সন্ধান পাওয়া যায় না—কেননা অনন্ত সকল বন্ধন ও সীমার পরপারে। ....আমরা যদি ভগবানকে জানতে চাই, তবে আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করতে হবে।

আজকাল একদল মনীষী আছেন যাঁরা অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের (superconscious knowledge or intuition) কথা শুনলেই নাসিকাকুঞ্চিত করে বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন এবং অতীন্দ্রিয়জ্ঞান যে জীবনে সম্ভব—তাও স্বীকার করতে সংকোচ প্রকাশ করেন। জানি, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—কিন্তু সেই কারণে বল্‌তে পারিনে যে এই জ্ঞান মানুষেব পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তুমি আর আমি সে জ্ঞান লাভ করিনে বলেই কি তার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হয়ে গেল? তোমার আর আমার জ্ঞানের পরিধি তো নিতান্তই সঙ্কীর্ণ; সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে অতীন্দ্রিয়জ্ঞান পড়লো না বলে যদি মনে করি অতীন্দ্রিয়জ্ঞান মিথ্যা ও অলীক—তবে তার দ্বারা আমাদের গোঁড়ামি ও নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রমাণিত হবে। আমরা কি

* Divine Heritage of Man—P. 33.

বিশ্বের সব কিছুকে জেনেছি যার দ্বারা আমরা বল্‌তে পারি যে আমরা যা জানি—এর বাইরে আর কিছুই নেই—কোন কিছু' থাকাও সম্ভব নয় ? "Simply because there are persons to whom religious experience is unknown, we cannot say that it is either unreal or impossible. Our limited experiences are not the standard for all. * যে মুহূর্ত্তে আমরা এ সহজ সত্যটা অহমিকার আতিশয্যে বিস্মৃত হই, তখনই আমরা গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার অন্ধকূপে বন্দী হয়ে পড়ি—আমাদের মন হারিয়ে ফেলে তার বিচার বুদ্ধি—আমাদের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে তার উদারতা।

আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান পেয়ে থাকি, তাই জ্ঞানের সবটুকু নয়। Intellcct যেমন জ্ঞানলাভের একটি পথ—তেমনি Intuition ও আর একটি পথ। এ দুটো কথা বিপরীত অর্থ প্রকাশক শব্দ মোটেই নয়—উপরন্তু তারা একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক। আমরা অনেক সময়ে ভাব প্রবণতাকে intuition-এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলি—তখন আমাদের দৃষ্টির সামনে জড়তা এসে দেখা দেয়—intellect এর সঙ্গে intuition-এর বিরোধ উপস্থিত হয়। এর জন্য দায়ী তো আসলে আমরাই। Intuition কখনো ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে সম্ভব নয়—তা চিরদিনই যুক্তি-বিতর্কের পারে—

* Radhakrishnan's 'Spirit In Man,—
Contemporary Indian Philosophy—P 276.

ইন্দ্রিয়ভূমির অতীত। প্রকৃত intuition সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারবো যে—"The two are not only not incompatible, but vitally united".

জীবনের জটিলতম প্রশ্নগুলির (যেমন আমি কে, আত্মার স্বরূপ কি ?) তার উত্তর মনীষার ভূমি থেকে অসম্ভব হলেও—আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা intution-এর ভূমি থেকে যে সম্ভব—তাই আমরা দেখেছি স্বামিজীর তপস্যাপূত ও সাধনাসিদ্ধ জীবনে—তারই জ্বলন্ত পরিচয় পাই তাঁর বিচিত্র গ্রন্থে, বহুল বক্তৃতায়, ও মহনীয় দর্শনে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হলেই জগতের ও জীবনের মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং এই উপলব্ধির মধ্যে ভক্তি ও যুক্তির চরম পরিণতি। "The peace which we obtain through it is not mere emotional satisfaction. In it the mind becomes irradiated with divine light and obstinate questions of reason find an answer"—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে সে কেবল হৃদয়াবেগেই শান্ত হয়, তা নয় ; এর মধ্যে মানব-মন হয়ে যায় দিব্য আলোকে সমুজ্জ্বল এবং যুক্তিজীবনের জটিল প্রশ্নগুলির উত্তরও এখানে পাওয়া যায়* স্যার রাধাকৃষ্ণানের এ উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। স্বামীজীর জীবন তো এ সত্যেরই জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বামীজীর অতুলনীয় জ্ঞানলাভের পশ্চাতে বুদ্ধি ও মনীষা থাকলেও সবার উপরে আছে তাঁর অপরিমেয় ও অতলস্পর্শ আধ্যাত্মিক অনুভূতি।

* Contemporary Indian Philosophy—P. 275

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে যেখানেই মানুষ সীমার ভূমিকে অতিক্রম ক'রে অসীমের ভূমিতে গিয়ে দাঁড়ায়, তখনই সে হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী এবং তখনই তার দৃষ্টি হয়ে যায় বিশাল, ব্যাপক ও পূর্ণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর স্বামীজী নিজেই তাঁর Philosophy of Work বই-য়ে স্পষ্ট করেই বলেছেন —"That knowledge is the highest which brings us into conscious harmony with the universe"*— অর্থাৎ যে জ্ঞানদ্বারা আমরা বিশ্বের সকলের সঙ্গে নিজের মহান ঐক্য উপলব্ধি করি—তাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এ জ্ঞান হলে মানুষ আর কাউকে ঘৃণা করতে পারে না—তখনই সে স্বার্থপরতার লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করে। তখনই সে নাম ও রূপের পশ্চাতে নিহিত অখণ্ড ও অব্যয় সত্যের সন্ধান পায়। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয় আকাশের কোটি কোটি তারকা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র-তটস্থ বালুকণা—এদের প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র; কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। এই ঐক্যের সন্ধান দেয় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। বহুত্বের মধ্যে একত্বের সাধনাই তো ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। ঋগ্বেদ পাঁচ হাজার বছর আগে ঘোষণা করেছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ঠিক এই কথা স্বামীজীর মুখেও বারে বারে শুনেছি—"That Reality is one but manifestations are diversified".

* Philosophy of work—P. 26

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য তা শুধু দেহে ও মনে—আত্মার দিক থেকে সকলেই এক ও অখণ্ড। "Although no two faces are alike and no two minds are the same, yet in Atman we are one".* স্বামীজীর দর্শনের মূলমন্ত্র এখানেই। ঐক্যের (unity of existence) সুরই তাঁর জীবনে, দর্শনে, লেখায় ও বক্তৃতায় সবার চেয়ে প্রবল হয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

স্বামীজী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন—"The Lord of the Universe is one with us and we are one with Him; the moment we forget this unity we become sinners".‡—অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে আমরা এক ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যে মুহূর্তে আমরা এই ঐক্যকে অস্বীকার করি বা বিস্মৃত হই—তখনই ভুল করি ভুল করে আমরা পাপ করি। পাপ ও পুণ্যের ভাল ব্যাখ্যা এর থেকে আর কি হতে পারে? আমরা যে পরিমাণে সকলের সঙ্গে নিজের ঐক্য উপলব্ধি করি—আমরা ততখানিই পুণ্য ও পবিত্র হই; পরিশেষে যখন আমরা ভগবানের সঙ্গে নিজেদের ঐক্য উপলব্ধি করি তখনই আমরা ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হই। সকল মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্যোপলব্ধিই তো জীবনের সব থেকে বড় কথা।

ভারতীয় ঋষির দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন যে অনন্তশক্তি ও অন্তহীন সম্ভাবনা প্রত্যেক জীবাত্মাতেই সুপ্তভাবে রয়েছে।

* Swami Ahhedananda In India—p. 246

‡ I bid—P 162

এই শক্তি ও সম্পদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানবজীবনে বিভিন্ন স্তর ও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। বর্ত্তমানে মানুষকে ছোট ও অসুন্দর বলে মনে হলেও আসলে সে তা নয়। পৃথিবীতে কোন মানুষই আসলে ছোট নয়—বড় আমি, বড় তুমি, বড় সবাই।

মানুষের মধ্যে দুটো আমি আছে—একটা পশু আমি, আর একটা দিব্য আমি। বর্ত্তমানে তার দিব্যপ্রকৃতি পশু আমির আবরণ দ্বারা সমাবৃত হয়ে রয়েছে। এই আবরণ ছিন্ন হলেই মানুষের মধ্যে দিব্য প্রকৃতি (divine-self of man) স্বমহিমায় জেগে উঠে। সেই আত্মজাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জীবনে আসে যুগান্তর! "When the animal man wakes up from this sleep of self-delusion, he seeks the light of the dawn of wisdom at a distance. Slowly he approaches that light. All his dreams and nightmares of animal-self have vanished. He is no more self-deluded. His spiritual eye is opened. He sees things as they are in reality. His human consciousness is transformed into God-consciousness. He has sacrificed his animal-self but in return he has gained his Real and Divine self"* —অর্থাৎ যখন পশু আমি মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠে, তখন সে জ্ঞানালোক সন্ধান করতে আরম্ভ করে।

* Self-sacrifice—Swami Abhedananda.

ধীরে ধীরে সে সেই আলোকের দিকে অগ্রসর হয় এবং পশু-আমির সমস্ত মোহ ও ভ্রম ক্রমশঃ দূরীভূত হয়ে যায়। তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তখন উন্মুক্ত হয় এবং সে প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ অবগত হয়। তার মানবচেতনা তখন আধ্যাত্মিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সে তার পশু-আমিকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, কিন্তু পরিবর্তে লাভ করেছে তার দিব্য-আমিকে—জেনেছে তার প্রকৃত স্বরূপকে। এত অল্পকথায় কি সুন্দরভাবেই স্বামীজী বুঝিয়েছেন মানবের আত্মবিকাশের স্তরগুলিকে।

মানুষ হচ্ছে পাশবভাব ও দেব-ভাবের মিলনক্ষেত্র।* মানুষ প্রথমে পাশব স্তরে অবস্থান করে—ইন্দ্রিয়ের প্রবল তাড়নায় সে তখন পরিচালিত হয়—ইন্দ্রিয়সুখই তার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। এ অবস্থায় সে অতীন্দ্রিয় কোন আনন্দ বা জ্ঞানের কথা ভাবতেই পারে না—উপরন্তু সে অতীন্দ্রিয়বাচক শব্দ ও ভাবমাত্রকেই ঘৃণা করে থাকে। স্বভাবতঃই এ অবস্থায় তার মধ্যে বৃহৎকে পাবার কোন সংগ্রামই দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের ভিতরে একটা something Divine, Immortol ও Eternal বস্তু আছে। তাকে যত দিন না জানা যায়, ততদিন মানুষের ক্রমাভিব্যক্তি হতে থাকে। এই যে ক্রমবিকাশ বা Evolution—এর পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যেই।‡ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণ

* Divine Heritage of Man—p. 194

‡ When spirituality is perfectly acquired, the soul realizes its divine nature and manifests divinity at every moment of its earthly existence. Then, and then alone, the purpose of

করার আগে প্রত্যেক মানুষকেই নৈতিক স্তরে (human planes) উন্নীত হতে হয়। কেন না morality is the gate' of spirituality অন্তপ্রর্কৃতির পরিবর্ত্তন ও ক্রমাভিব্যক্তির ফলে মানুষের একদিন মোহনিদ্রা ভেঙ্গে যায়-- মানুষের মধ্যে তখন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হয় animal-selfএর সঙ্গে real-selfএর। এ সংগ্রামে কখনও মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের কাছে পরাভূত হয় - আবার কখনো বা সে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই হলো মানুষের moral বা ethical plane. নৈতিকস্তরের যে মানব—পার্থিব বাসনা কামনার উর্দ্ধে তার প্রতিষ্ঠা নয়। সে মানুষ থাকে সদাসর্ব্বদা সংগ্রামরত। পাপের সঙ্গে পুণ্যের—animalityর সঙ্গে divinityর যুদ্ধই এই eithical manএর সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সংগ্রাম যখন মানুষের মধ্যে থেমে যায়—মানুষ যখন পাশবস্তর ও পাশবভাবের বহু উর্দ্ধে উত্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়—তখনই সে আধ্যাত্মিকমানবরূপে পরিগণিত হয়। আধ্যাত্মিকমানবের লক্ষণাদি স্বামীজীর ভাষা উদ্ধৃত করেই বলি,—"The struggle will only cease when the animal nature is completety conquered, and the moral man has become truly spiritual, or divine. When that stage shall have been reached there

evolution is fulfilled. We are all bound to reach that stage of spiritual perfection which is the ultimate goal of evolution. See Abhedananda's Cosmic Evolution and Its purpose.—P. 16.

will be no room for temptations. The moral man can he tempted by animal attractions, but the truly spiritual man is far above all temptations, he is beyond the reach of the lower tendencies and animal propensities that trouble the moral man".*

ভারতীয় বেদান্ত দর্শন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই আধ্যাত্মিকতার আদর্শ প্রদর্শন করে এবং শুধু তাই নয় আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণের সহজতম অথচ প্রকৃষ্ট পথেরও সন্ধান দেয়। স্বামীজী ছিলেন আধ্যাত্মিকজগতের দিব্যপুরুষ—তাই তিনি মানবকে শুধু ঐক্যের আদর্শের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি—কি ভাবে সে সেই আদর্শে পৌঁছাতে পারে—তাও তিনি তীর্থযাত্রীকে প্রদর্শন করেছেন। বিশেষ কোন একটা পথ তিনি মানুষকে দেখান নি—কারণ তিনি জানতেন বিভিন্ন মানবের মনোবৃত্তি, মানসিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিভিন্নধরণের। কাজেই সকলকে তিনি এক পথে চলার নির্দ্দেশ না দিয়ে তিনি বললেন,—"There are as many ways to truth as there are individuals who seek it". ‡

স্বামীজী খুব ভাল করেই জানতেন যে আচার ও নিয়ম, পদ্ধতি ও বিধানের দিক থেকে মানুষে মানুষে বিচিত্রতা থাকবেই—

* Spiritual Unfoldment—p. 68

‡ Spiritual Unfoldment—p. 93.

ঐক্য কেবল আদর্শের মধ্যেই নিহিত। আদর্শের চাইতে পন্থাকে সচরাচর আমরা বেশী মূল্য দেই বলেই আমাদের জীবনে দেখা দেয় বৈষম্য ভেদাভেদ, ও অনর্থ কলহ।

আমাদের আদর্শ হচ্ছে পূর্ণ হয়ে উঠা—

চারিদিক হতে অমর জীবন,
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিবো কবে?"—রবীন্দ্রনাথ

এই পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে রয়েছে। পূর্ণতার বেদনা যুগে যুগে মানুষকে তার বিরাট লক্ষ্যের পানে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। সকল মানুষ এক পথে চলে না—কিন্তু সকলেরই মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও চরম পরিণতি একই—ব্রহ্মানুভূতি (God-realisation) ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্ম বিসর্জ্জন! আদর্শ যখন সব মানুষেরই এক—তবে মানুষ কেন মানুষকে ঘৃণা করে—অত্যাচার করে? আমরা সকলেই অসীম পুরুষের অংশ—আমাদের সকলের মধ্যেই একই বিশ্বপ্রাণের বিপুল প্রবাহ—আমরা সকলের সঙ্গেই যুক্ত। যে মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের চারিপাশের নরনারীকে ঘৃণা করি, নির্য্যাতন করি, উপেক্ষা করি বা অনাদর করি, তখনই আমাদের জীবনবীণার তার ছিঁড়ে যায়—আমাদের জীবন হারিয়ে ফেলে তার সুর আর ছন্দ। জীবনের চরম অভিশাপ তো এটাই। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে গেলে সকলের আগে নিজেকে

ব্যাপ্ত করে দিতে হবে সকলের মধ্যে—সকলেই আমার ভাই—কেউই আমার পর নয়! ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-মুক্তি অসম্ভব। কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে নিজের চেতনা ব্যাপ্ত করে না দিলে ভগবানলাভ কখনই সম্ভব নয়। তাই তো স্বামিজী বার বার মুক্তিপথের যাত্রিগণকে সম্বোধন করে বলেছেন,—"We must learn to merge our smaller personality into the bigger personality of humanity". *

স্বামিজী ছিলেন আসলে একজন বেদান্ত-দার্শনিক। তাঁর দর্শন হচ্ছে একটা something living and not speculative. মতবাদের কারাগারে তিনি মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে চান নি—তিনি চেয়েছেন মানবকে সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত করে অসীমের সন্ধানে নিয়ে যেতে। দেশ, কাল, নিমিত্তের দ্বারা বিশেষিত ভূমি থেকে যে জ্ঞান পাই—সে জ্ঞানেও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি—তিনি গেছেন তারও পরপারে—বুদ্ধির রথে আরোহণ করে নয়—মনীষার দ্বারা নয়—আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা। সমাধিতে তিনি উপলব্ধি করেছেন অসীমকে নিজের ভিতরে, নিজেকে অসীমের ভিতরে, এবং উপলব্ধি করেছেন বেদান্তের সেই "সোহম" বাণী। † বেদান্ত-দর্শনের সর্ব্বোচ্চ

* See Swami Abhedananda's Ideal of Education.

† The word 'rèalize" means something more than ordinary knowing. By "relaizing" we mean being and becoming one with the Infinite—Divine Heritage of Man—P. 32.

আদর্শ তিনি স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সত্যকথা বলতে কি—তিনি ছিলেন বেদান্ত-দর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি (living embodiment of Vedanta philosophy)। বেদান্তের সিদ্ধান্তই ছিল তাঁর অনুভূতিলব্ধ সিদ্ধান্ত—বেদান্তের ভিত্তিতেই তিনি সকল প্রশ্নের সমাধান ও সকল বৈচিত্র্যের সমন্বয়সাধন করেছেন। বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণীই তাঁর বাণী—ঠাকুরের বাণী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। বেদান্ত-দর্শনের মধ্যেই বিশ্বদর্শনের ঘটেছে চরম ও পরম পরিণতি। প্রকৃত দর্শনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি স্বামিজী তাঁর "প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ" নামক অমূল্য বক্তৃতায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

প্রকৃত দর্শন এক সরল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে জড়বিজ্ঞান যে সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অপরাগ, সেই সমস্ত অপরিহার্য্য সমস্যার সমাধানে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সহিত সমস্ত দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য করিয়া মানবাত্মার সকল প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সুযোগ প্রদান করে। ব্যাপকভাবে দর্শনশাস্ত্রের তিনটি কার্য্য ঃ—(১) জড়বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি নিয়মাবিষ্কারে জগদ্রহস্যের বিশ্লেষণ। (২) দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের উৎপত্তি ও সীমা নির্দ্ধারণও দর্শনশাস্ত্রের একটি কার্য্য। পরিদৃশ্যমান জগতে প্রত্যক্ষজ্ঞানে সীমাবদ্ধ মানবমনকে অনির্ব্বচনীয় অনন্যসাপেক্ষ ও বাক্যমনের অগোচর ভূমিতে পরিচালিত করা দর্শনশাস্ত্রের তৃতীয় কর্ত্তব্য। জড়জগতের মূল কারণ, জীবের উৎপত্তি,

জাগতিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য ও জন্ম মৃত্যুর রহস্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধান অন্যোন্যাপেক্ষ জগতে অসম্ভব। এক নিরপেক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব জানিলে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়।

কেবলমাত্র অধ্যাত্মরাজ্যের তত্ত্বালোচনাই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ; পরন্তু জগতের ত্রিবিধ দুঃখের মূল—অবিদ্যা আমি, ও আমার এই জ্ঞান হইতে মানবমনকে বিমুক্ত করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি স্থাপন ও দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য। সত্যের দিকে চালিত করা এবং সমস্ত বন্ধন হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা প্রকৃত দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। বেদান্তদর্শন ভিন্ন অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রই দক্ষতার সহিত এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে না। এই কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতমধ্যে একমাত্র অদ্বৈতবেদান্তই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন।* Contemporary Indian Philosophy নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে স্বামীজী তাঁর Hindu Philosophy of India নামক লেখায়ও ঠিক এই কথাই আলোচনা করেছেন এবং নানাকারণ প্রদর্শনের পর পরিশেষে পরিস্ফুট ভাষায় বলেছেন ঃ—"The monistic phase of Vedanta is the most sublime of all. Very few thinkers can appreciate the grandeur of spiritual oneness. Yet, herein lies the solution of the deepest problems of science, philosophy

* ভারত—অতীত ও বর্ত্তমান—পৃষ্ঠা ৪৯-৫২

and metaphysics and the final goal of all religions"

বেদান্ত দর্শনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম দর্শন। এই দর্শনের অমর বাণী প্রচারই স্বামিজীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। যুগোপযোগী করে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যরাশির ভিতর দিয়ে বেদান্ত-দর্শন তিনি যে ভাবে প্রচার করেছেন সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে আর নেই বললেও চলে। বেদান্তের তিনিই তো ছিলেন এযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতা! বেদান্তের গভীরতম সত্যগুলি তাঁর জীবনে যে ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল—তা আরও মনোহর —তা আরও বিস্ময়কর। উপসংহারে ভারতের এই বিজয়ী বেদান্ত কেশরীর চরণপ্রান্তে আমাদের প্রণতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেই এ প্রবন্ধ শেষ করি।

ভারতের দুই কর্ম্মবীর

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দকে আমরা সাধারণতঃ সিদ্ধ-সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ও বিশ্ববিখ্যাত বৈদান্তিক হিসাবেই জানি। তাঁরা যে শুধু ধর্ম্মব্যাখ্যাতা তা, নয়—তাঁরা কর্ম্মী, বাগ্মী, পণ্ডিত, গ্রন্থকার এবং যোদ্ধাও বটে। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানকর্ম্মভক্তির আদর্শ জ্বলন্তভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রাচীন-যুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বর্ত্তমান শতাব্দীতে রামকৃষ্ণদেব জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির যে অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ মানুষকে শিক্ষা দেন-তার মূর্ত্তপ্রতীক এই দুইজন ভারতীয় সন্ন্যাসী। কখনও তাঁদের মধ্যে পরাভক্তির কমনীয়তা, আবার কখনো জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, আবার কখনো বা নিষ্কাম কর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ! বৃত্তিনিচয়ের এই সামঞ্জস্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে" বিশেষভাবেই বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের অতুলনীয় দার্শনিকতা ও সমাধিলব্ধ দিব্যজ্ঞানের বিষয় আমরা সাধারণ মানুষ যথাযথভাবে বর্ণনা করতে অক্ষম। নবযুগে ভারতে ও ভারতবহির্ভূত সভ্যজগতে যে ধর্ম্মান্দোলন চলেছে—তার পেছনে এই দুইজন মহাপুরুষের অবদান অনন্যসাধারণ। স্বামী বিবেকানন্দই সর্ব্বপ্রথম বেদান্তের বিজয়বার্ত্তা আমেরিকায় বহন করে নিয়ে যান; ঠিক তাঁরই পশ্চাতে আবার তাঁর যোগ্যতম গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ এসে সমগ্র আমেরিকাকে বেদান্তের

বিজয়ভেরীতে মুখরিত করে তোলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত বি, সি চ্যাটার্জ্জী বলেন,—"Columbus discovered America's body, but Vivekananda and Abhedananda, these two great sons of India, discovered America's soul"* অর্থাৎ কলোম্বাস আমেরিকার দেহকেই শুধু আবিষ্কার করেন; কিন্তু আমেরিকার আত্মার সন্ধান দেন ভারতমাতার দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান—বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ! এই উক্তির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। যথার্থই এই দুইজন সন্ন্যাসী আমেরিকার অন্তরাত্মাকে স্পন্দিত করেছিলেন। সেই সভায় বক্তা আরও বলেন যে, প্রাচীনকালে বাঙালীরাই বুদ্ধের মহতী বাণী তিব্বত, চীন ও জাপানে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল; সেদিন বাঙালী বুদ্ধের জ্ঞানালোকে সুদূর প্রাচ্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এই নবযুগেও ঠিক তেমনি বাঙালীরাই রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের মহান্ বার্ত্তা আমেরিকা ও ইউরোপে বহন করে নিয়ে যান; সেই সকল নির্ভীকহৃদয় মহামানবের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ। এই দুইজন সন্ন্যাসী ভারতের যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবেই গিয়েছিলেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সে পরাধীন। কাজেই এই দুইজনের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য ছিল আরও ঢের বেশী সুকঠিন।

* Amrita Bazar Patrika, 3 October 1939.

যুগ যুগ ধরে পাশ্চাত্যজগতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্তধারণা প্রচলিত ছিল—তা দূর করেন এই দুইজন বিরাট পুরুষ। কাজেই তাঁদের কাহিনী যখন যথার্থরূপে পাঠ করা যায়, তখন সত্যই আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হয়ে পারি না।

এই দুইজন মহামানবের ধর্ম্মজীবনের দিকটা ছেড়ে দিয়েও তাঁদের মধ্যে কর্ম্মের একটা বিরাট দিক ছিল। বহু সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা নির্জ্জনে সারাজীবন ধ্যানধারণাই করে যান—পৃথিবীর নানা কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে তাঁদের আমরা খুঁজে পাই না। নবীন ভারতের এই দুইজন ঋষিমানবকে কখনই তাঁদের দলভুক্ত করতে পারবো না। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদাই শিষ্যদের বলতেন,—"তোদের একটার সামান্য উন্নতির জন্য বিশলাখ শরীরও দিতে পারি।" স্বামী বিবেকানন্দ গুরুদেবের নিকট থেকে এই আত্মত্যাগের মহামন্ত্র লাভ করেছিলেন। তাই তিনি ব্যক্তিগত মুক্তির আদর্শকে তুচ্ছ করে নিখিলজীবের মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ন্যায় অভেদানন্দ প্রভৃতি গুরু-ভ্রাতার আদর্শও ছিল একরূপ—'Personal liberation'কে তাই তাঁরা কেহই একান্তভাবে বড় করে দেখতে পারেন নি। (Prabuddha Bharat, Oct, 1939). তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বহুজনের কল্যাণ—বহুজনের মঙ্গল। বেদনায় নিপতিত মহামানবের ক্রন্দন তাঁদের কানে গিয়ে পৌঁছিলো—তাঁরা সেদিন বাস্তবের প্রচণ্ড আহ্বানকে কোন মতেই উপেক্ষা

করতে পারলেন না। তাঁরা তখন নির্জ্জন সাধনার স্থান পরিত্যাগ করে জীবনের ধূলিধূসরিত বন্ধুর পথে অবতীর্ণ হলেন। দুঃস্থ নিপীড়িত মহামানবের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য কতদিন পথের ধূলায় অনশনে বা অর্দ্ধানশনে কাটিয়েছেন—কত রাত্রি ইট মাথায় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে তরুতলে অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের পার্থিব বিত্ত বা ঐশ্বর্য্য কিছুই ছিলো না—থাকলে তা নিশ্চয়ই দান করতেন। তাঁদের দেবার মধ্যে ছিল ভক্তি, ভালবাসা ও সেবা। এই ভক্তির আদর্শই বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর "আনন্দমঠের" উপক্রমণিকায় প্রচার করেছেন। যে ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা বাল্যে ও কৈশোরে ঈশ্বর সাধনা করেছেন ঠিক সেইরূপ একনিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়েই তাঁরা আবার বিরাটকায় জন্মভূমির সেবা করেছেন। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ তাঁদের মধ্যে অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়েছিল। ভগবানকে তাঁরা খুঁজেছেন পৃথিবীর মধ্যে—পৃথিবীর নরনারীর প্রতি তাই তাঁদের প্রেম ছিল সীমাহীন। তাঁরা জানতেন যে প্রতিদিন জীবনের চারিপাশে যাদের দেখি, তাদের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেনঃ

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো ;
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

[গীতাঞ্জলি]

এটা শুধু কবির কথা নয়—এই দুই বীর সন্ন্যাসীর প্রাণের কথাও বটে। বিবেকানন্দ বলতেন—সকলের আগে মানুষের পূজা করো—তোমার চারিদিকে যাদের দেখছ তাদের ভক্তি করো—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

স্বামী অভেদানন্দও ঠিক ঐ একই সুরে বলেছেন,—"Humanity is divinity. চণ্ডালই হোক আর যেই হোক না কেন, এই সমস্ত জনসমুদ্রের আত্মা সেই বিরাট পুরুষ ব্রহ্মের রূপ। এদের ভিতরে ভগবান দেখে এদের জন্য কাজ করো। এই ঈশ্বরের আরাধনা। যে মন্দিরে গরীব, চণ্ডাল এ সব ঢুকতে পায় না সেখানে কি কখনো দেবতা থাকতে পারে? আর মন্দিরে দুটো ফুল ফেলেই বা কি হবে? এই দেহটাকেই মন্দির করো। দেহরূপ মন্দিরে আত্মারূপ দেবতা রয়েছেন—তাঁর পূজা করো।" (মহারাজের কথা – স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ)

জাতীয় জীবন গড়ে তুলবার জন্য সকলের আগে চাই শিক্ষা। সুশিক্ষা না পেলে জাতির কোনপ্রকার উন্নতিই সম্ভব নয়। সুশিক্ষাই সকল অনর্থ ও অমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার; বর্ত্তমানে এ দেশের ছাত্রগণ যে শিক্ষা পায়—তাতে মানুষ গড়ে উঠেনা—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা হচ্ছে "ক্রীতদাস হবার জঘন্য যন্ত্রমাত্র।" এই শিক্ষার ফলে পবিত্রতা, সংযম, গুরুভক্তি প্রভৃতি গুণ ছাত্রগণের চিত্ত থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়ে যায়। বর্ত্তমান-কালীন শিক্ষায় শারীরিক ও নৈতিক আদর্শ উপেক্ষিতই হয়ে থাকে; সেই জন্য শিক্ষাপদ্ধতিকে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলবার প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ জাতির সামনে সুশিক্ষার আদর্শ ধরে বলেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man" মানুষ যদি জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠতে চায় তবে তাকে নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক এই ত্রিবিধ বিষয়েই সমুন্নত হতে হবে। যে জাতি দেহের দিক থেকে দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী—সে মনের দিক থেকে যত বড়ই হোক—তাকে নিয়ে শক্তিশালী জাতি গঠিত করা যায় না। ভবিষ্যতের অনিন্দ্যসুন্দর যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন মহামানবগণ যুগে যুগে দেখেছেন—তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে সর্ব্ব-প্রথম চাই সুন্দর ও সুগঠিত দেহ। তাই এই দুইজন সিংহবিক্রমী পুরুষ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"We must get muscles of iron and nerves of steel"—অর্থাৎ আমাদের দেহের মাংস-পেশীগুলি হবে লৌহের মত কঠিন এবং স্নায়ুগুলি হবে ইস্পাতের

মতই সুদৃঢ়। যারা আজও মনে করেন বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ শুধু আত্মার মহিমাই প্রচার করেছেন তারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমেরিকান গণতান্ত্রিক কবি হুইটম্যান (Walt Whitman) তাঁর Leaves of Grassএ-বলেছেন,—I am the poet of the Body, and I am the poet of the Soul, এই কথার মধ্য দিয়ে কবি দেহ ও আত্মা দুয়েরই জয়গান গেয়েছেন। ঠিক সেইরূপ এই দুয়েরই বিপুল জয়ধ্বনি আমরা সর্ব্বদাই শুনতে পাই স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের কণ্ঠে। তাঁদের সম্বন্ধে যদি বলি, "They are the poets of the Body, and they are the poets of the Soul," তবে সত্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অমর্য্যাদা প্রদর্শন করা হবে না। জীবনকে ও জগৎকে তাঁরা কোনদিনই অস্বীকার করেন নি। যারা বলে বেড়ায় যে ইহকালে পরের জুতা লাথি খাও, দুঃখ সহ্য করো—মূক পশুর মত জীবন কাটাও—মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য স্বর্গে অক্ষয় আনন্দ ও শান্তি সঞ্চিত থাকবে—সেই সকল অজ্ঞ, অশিক্ষিত, ধর্ম্মবিমূঢ় ও আত্মঘাতীকে যোদ্ধা-প্রকৃতি বীর সন্ন্যাসীদ্বয় কখনই ক্ষমা করতেন না। জীবনে পূর্ণতা ও শান্তি এ পৃথিবীতেই সম্ভব। বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করে ভবিষ্যৎকে তাঁরা অযথা বেশী মূল্য কোন দিনই দেন নি। তাই তাঁরা পরকালের দোহাই দিয়ে মামুলী পথ ধরে কোন কথাই বলতেন না। তাঁরা সর্ব্বদাই মানুষের কানে যে বাণী শোনাতেন তা হচ্ছে,—"Here and now"। তাঁরা যে দেশবাসীকে প্রাণায়াম ও আসনশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য

পালনের কথা বলতেন, তার কারণ তার ফলে দেহে বীর্য্য ও শক্তির সঞ্চার হয়—মানুষ দীর্ঘায়ু হয়ে উঠে। [Yogic Culture And Longevity—Statesman, 18-5-41] তখনই সে জীবনকে ও জগৎকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারে। সংসারকে ভোগ করতে গেলেও যোগ চাই—সংযম চাই।

জাতীয়তার হোমানল এই দুইজন মহাতেজস্বী সন্ন্যাসীর চিত্তে সর্ব্বদাই প্রবলভাবে জ্বলতো। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁরাও প্রচার করেন। চিরদিনই ভারতের নরনারী—আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র ; আমি হিন্দু, আমি মুসলমান,—এই ভাবেই আত্মপরিচয় দিয়ে এসেছে ! জাতির সঙ্গে নিজের চেতনাকে সে কোন দিনই যুক্ত করে দেয় নি। তার ফলেই আমাদের পরাধীনতা ও সর্ব্বনাশ হয়েছে। একজন ইংরাজকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সকলের আগে সে বলে—আমি ইংরাজ ; একজন জার্ম্মাণকে জিজ্ঞাসা করলে, সেও বলে—আমি জার্ম্মাণ। ভারতের নরনারীর এই সঙ্কীর্ণ আত্মবুদ্ধি দেখে বিবেকানন্দ দুঃখিত হয়ে বললেন,—"বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" দেশের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতম করে দেবার জন্য স্বামী অভেদানন্দও স্বদেশীযুগে দেশবাসীকে বারবার বলেছেন,—ধর্ম্মের দিক থেকে, আচার ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে যত বিভেদ ও পার্থক্যই থাকুক—"As Indian nation" তোমরা সকলেই এক ও অখণ্ড ! মহা-

জাতীয়তার পতাকাতলে ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীকে তাঁরা দাঁড় করতে চেয়েছেন। তাই তাঁরা জাতীয়তার দিক থেকেও আমাদের নমস্য।

আজ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন চলেছে তার পেছনে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের বিপুল চিন্তাধারাও বিদ্যমান। তাঁরা জানতেন যে দেশের মধ্যে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত এই যে দুটো শ্রেণীগত বৈষম্য সেটাই সব থেকে সাংঘাতিক। কোটি কোটি মানুষকে অস্পৃশ্য করে রেখে আমরা সব থেকে বড় পাপই করেছি। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ভিন্ন দেশের মুক্তি নেই। সমাজের তথাকথিত শিক্ষাভিমানীরা যাদের আজ অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করেন—তারাই তো প্রকৃতপক্ষে জাতির প্রাণ—জাতির মেরুদণ্ড। সর্ব্বসাধারণকে স্বীকার করেই জাতি বড় হয়। আমাদের ভারতীয় সমাজে একদিন তাদের বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। সেদিন তারা শিক্ষা পেতো—জ্ঞান পেতো—ধর্ম্ম পেতো। সে সময় সমগ্র ভারতই উন্নতির পথে জয়যাত্রা সুরু করেছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে এমন একটা সময় এলো যখন সমাজের কর্ত্তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থকে দলিত মথিত করতে আরম্ভ করলো। তারা সেদিন সত্যটা ভুলে গিয়েছিল যে, সাধারণ মানুষেরা যদি তলায় নেমে যায়—তবে সারা দেশটারই পতন ঘটে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিন তারা বিস্মৃত হলো যে, ঃ

"যারে তুমি নীচে ফেলো, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে ফেলিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"।

তাই সেদিন সাধারণ লোকেরা উপেক্ষিত হতে লাগলো—অশিক্ষায় ও অবজ্ঞায় তারা দিনে দিনে দেহে ও মনে নীচে নামতে আরম্ভ করলো। তাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের পতনও স্থুরু হলো। পরিশেষে এমনই হলো দেশের শোচনীয় অবস্থা যে, তলায় যারা রইলো তাদের স্পর্শ বা ছায়া মাড়ানোও পাপ বলে গণ্য হতে লাগলো। সেদিন স্বার্থপর, মূঢ় ও অদূরদর্শী সমাজকর্ত্তারা ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সর্ব্বনেশে ভাব সমাজের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিলো—এবং প্রচার করলো—যে এ বৈষম্য চিরদিনেরই—এ ঐশ্বরিক বিধান। তার ফলেই আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণতি। মাদ্রাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের Pariah বা চণ্ডাল বলে ঘৃণা করা হয়ে থাকে এবং তাদের ছায়া মাড়ালে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণগণ করেন। এই শোচনীয় অবস্থা দেখে ভারতের এই দুইজন বিশালপ্রাণ মহামানবের চিত্ত কেঁদে উঠেছিল। বিবেকানন্দ সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন, চিরপদদলিত মহামানবগণ তোমাদের আমি প্রণাম করি। অশ্বিনীদত্তকে তাই তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন,—"চামার, মুচি, মেথর, মুদ্দাফরাসদের ভিতর গিয়ে বলুন—তোরাই জাতের প্রাণ—তোদের অনন্ত শক্তি রয়েছে। দুনিয়া ওলট পালট করতে পারিস্। একবার তোরা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়া দিকি ; জগতের

তাক লেগে যাবে। ওদের ভিতর স্কুল করুন—আর ধরে ধরে পৈতা দিন।"* ঠিক এই রকমের কথা স্বামী অভেদানন্দের মুখেও শুনতে পাই। স্বদেশীযুগে তিনিও don't touchism-এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। Ideal of Education নামক বক্তৃতায় তিনি কি জোরের সঙ্গেই না বলেছেন,—"Why should you hate a Chandal ? Why is he a Chandal ? Because you have made him so. Therefore, take the blame upon your own shoulders and correct it and make him a saint. Give him proper training, grant him proper education, love him, and give him a chance to stand on his own feet."

সমাজে যারা পতিত হয়—যারা ছোট হয়ে থাকে - যাদের ভাগ্যে দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনা ভিন্ন কিছুই জোটে না—তাদের ঐ শোচনীয় ও বেদনাময় জীবনের জন্য তারা নিজেরা কতটুকু দায়ী তা মেপে বলা সহজ নয়; কিন্তু সমাজপতিরা যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। Jean Valjean আগে চোর ছিল না—সমাজের রূঢ় আচরণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতিই তাকে চৌর্য্যবৃত্তিতে দীক্ষিত করলো। তার ঐ হীনতা ও মনুষ্যত্বের অবমাননার জন্য দায়ী কে? সমাজ, না Jean Valjean ?

* ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

নারীশিক্ষার কথাও স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ সমস্ত তনুমন দিয়েই ভেবেছেন। দেশের অর্দ্ধেক নারী। নারীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত না করে তোলার অর্থ দেশের অর্দ্ধেককে অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখে দেওয়া। নারীরাই জাতির জননীস্বরূপা। তাদের সব থেকে বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে সভ্যজগৎকে সুসন্তান উপহার দেওয়া। এই কর্ত্তব্যসাধনে তাকে জয়যুক্ত হতে হলে—তার সুশিক্ষা একান্তই প্রয়োজন। শিশুর উপর মায়ের প্রভাব যত বেশী—এত বেশী আর কারুরই নয়। মায়েরা যদি সুশিক্ষিতা হন, তবে শিশুরাও স্বভাবতঃ শৈশব থেকে সুশিক্ষা পেতে পারে। স্বদেশীযুগে তাই স্বামী অভেদানন্দ দেশবাসীকে সিংহবিক্রমে বলেছিলেন,—"Foremost of all, educate the women. Women must have a share in all the scientific knowledge and education of the day. No nation has become great by neglecting the education of women. They must be educated, and they must have certain privileges. Women are not less intelligent than men, only you have not given them opportunities. Give them opportunities, and they will glorify your country." ভারতীয় নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন—যে সীতাই ভারতীয় নারীত্বের মূর্ত্ত প্রকাশ—তাঁর পদাঙ্ক

অনুসরণ করে জীবনগঠন করাই ভারতীয় রমণীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

সমাজের নিকট প্রতি মানুষেরই ঋণ অপরিসীম। যে মুহূর্ত্তে আমরা পৃথিবীতে আসি, তখন থেকেই সমাজের কাছে ঋণপাশে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি। আমরা যত প্রতিভা নিয়েই জন্মাই না কেন—সমাজের অবদান ও সাহচর্য্য না পেলে আমরা কখনই জীবনে বড় হয়ে উঠতে পারি না। জন্মগ্রহণের পরই তন্তুবায় আমাদের বস্ত্র দেয়, চাষী আমাদের অন্ন দেয়, শিক্ষক আমাদের আলোক দেন, মাতাপিতা আমাদের স্নেহ দান করেন। এদের সকলের সাহচর্য্য পাই বলেই আমাদের আত্মবিকাশের সুযোগ ঘটে; যদি না পেতাম তবে ফোটবার আগেই জীবনকুসুম কুঁড়ি অবস্থায় শুকিয়ে মরে যেতো। বড় হয়ে তাই সমাজের ও দেশের নিকট যে ঋণ তা প্রত্যেকেরই শোধ করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর Philosophy of Work নামক গ্রন্থে বলেছেন,—"Every individual, on account of his birth, owes something to state and country, to family and neighbours, to his spiritual teacher and to his higher self. While he lives in society, he owes a duty to society. So long as he is guarded and protected by social conditions, he is in debt to the social body which maintains them. How

can he pay that debt ? By being a good member of society, by doing what he can to help all other members, and making every effort to fulfil his obligation to the community and mankind"—বর্ত্তমান যুগের বিপ্লবীদের কথাও এই রকমেরই। আমরা জন্মের পর থেকেই সকলের কাছে ঋণপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ি—মাতা, পিতা, চাষী, ধোপা, মুচি, মেথর, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, আচার্য্য—সকলের কাছেই। এ ঋণকে যে স্বীকার করে না—ভাবী যুগে যে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হবে—সেখানে তার স্থান হবে না। বর্ত্তমানে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একজন অপরের ঋণকে একেবারে অস্বীকার করেও দিব্যি দিন কাটাতে পারে—সম্মানও পেতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে এ রকম মানুষকে অর্থাৎ যে সমাজকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে ফাঁকি দেয়—তাকে চোরের পর্য্যায়ে ফেলা হবে। বিবেকানন্দ তো সে-সব মানুষকে "traitor" (বিশ্বাসঘাতক) বলে সম্বোধন করে গেছেন। সমাজের কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নয়—সকলের কাছেই সকলে ঋণী। এ সত্যই নবযুগের বাণী। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন,—"So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who having been educated at their expense, pay not the least heed to them" অর্থাৎ যারা লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত ও

অশিক্ষাগ্রস্ত নরনারীকে বঞ্চিত করে শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করে না—আমি বলি তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাসঘাতক।

ইউরোপে যে দিন Renaissance ও Reformation (বিদ্যার নবজন্ম ও সংস্কার আন্দোলন) হলো—সে দিনে থেকেই প্রকৃতপক্ষে উন্নতির পথে ইউরোপের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে।* মধ্যযুগে মানুষ ছিল রাষ্ট্র, পুরোহিত-প্রথা ও ধর্ম্মতন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ। অন্ধবিশ্বাস, হেঁয়ালি, বিচারহীন আচারের প্রাচুর্য্য তখন মানুষকে পরিচালিত করতো। সেদিন ইউরোপের অন্তরাত্মা গুমরে গুমরে কেঁদেছিল। তারপর কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এক শুভ দিন এসে উপস্থিত হলো—মানুষের কণ্ঠ থেকে authority-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর উৎসারিত হতে লাগলো। মুক্তি ও ব্যক্তিত্বের (liberty and personality) বাণী কণ্ঠে নিয়ে নরনারী জেগে উঠলো… ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের বন্ধন, পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকের প্রাধান্যের শৃঙ্খল তাদের সর্ব্বাঙ্গ থেকে খসে পড়তে লাগলো। এখন থেকে যুক্তি, বিচার ও বিবেকই হলো তাদের ধর্ম্মজীবনের সাথী। চার্চ্চের মিথ্যা প্রাধান্যকে অস্বীকার করার ফলে মানুষ এবার মানুষ হবার পথ খুঁজে পেলো। এখন ভারত-বর্ষের কথা আবার বলি। যুগ যুগ ধরে পুরোহিতগণ

* Gardiner's A Student's History of England
Pages, 366-379.

নানাপ্রকার মিথ্যা ও প্রাণহীন আচারের বেড়াজালে ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে বেঁধে রেখেছিল। অন্ধবিশ্বাস ও পুরাতনের জয়ধ্বনি সে-সময় বেরুতো তাদের কণ্ঠ থেকে। মানুষকে ছাপিয়ে তখন বড় হয়ে উঠেছিল ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মতন্ত্র। তারপর মধ্যযুগের তিমির রাত্রি ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এলো। নবযুগের স্বর্ণ ঊষার দুয়ারে দাঁড়িয়ে এমন সময় রাজা রামমোহন রায় বার বার বজ্রকণ্ঠে মুক্তি ও ব্যক্তিত্বের মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। সে সময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তী একশত বৎসর পর্য্যন্ত যে সময়টা—সেটা হলো জাতির জাগরণের পালা। তারপর অন্ধবিশ্বাস ও প্রাণহীন আচারের উপর যুক্তি এবং বিচারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ। ভারতবর্ষে ও জগতে তাঁরা যে ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য সারা জীবন সাধনা করেছেন তা হচ্ছে মানবধর্ম্ম যা মানুষকে ভালবাসতে শেখায়···যা আমাদের authority ও priestcraft (ধর্ম্মযাজকের প্রাধান্য) থেকে মুক্তি দেয় – যা আমাদের আত্মবিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে। "The world needs a scientific religion. It needs the supremacy of reason over blind faith" এই ছিল তাঁদের বাণী। তাই তাঁদের মুখে শুনি "As the spirit and ideal of modern science have been absolute freedom of thought and independence of the authority of books or personalities

and as its sole object has been the discovery of truth and the worship of nothing but truth, so shall be the spirit, ideal and object of that religion which will be fitted for the present century, which shall stand on the adamantine rock of truths, already discovered by modern science.* The true religion will reign supreme over the minds of all the seekers after Truth, who live in the present century. In that religion of science there will be no scheme of salvation ; no dogma of heaven or hell ; no fear of eternal punishment". অর্থাৎ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আদর্শ হলো চিন্তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—পুস্তক ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের সন্ধান ও সত্যোপাসনা। বর্ত্তমান শতাব্দীর উপযোগী ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং আদর্শও হবে বিজ্ঞানেরই মত ; এ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যের অটল ভিত্তির উপর। প্রকৃতধর্ম্ম বর্ত্তমান শতাব্দীর সমস্ত সত্যান্বেষীর মনের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করবে। সেই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মে মুক্তির কোন পরিকল্পনা থাকবে না, থাকবে না স্বর্গ অথবা নরকের কোন বিশেষ বিধি,

* The Religion of the Twentieth Century
—Swami Abhedananda.

থাকবে না চিরকালীন শাস্তির ভয়। এই ধর্ম্মই প্রকৃতধর্ম্ম— এর অনুসরণে ও পালনে মানুষ 'মানুষ' হয়ে উঠে পূর্ণ গৌরবের মধ্যে। যারা আজও ধর্ম্মজগতে মানুষকে বন্ধনে ফেল্‌বার চেষ্টা করছে বা করবে – নবযুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের আঘাতে তারা খান খান হয়ে যাবে। ভারত জেগেছে—মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে -- তাকে বেঁধে রাখে কার সাধ্য ?

'None can resist her any more ; never is she going to sleep any more , no outward powers can hold her back any more ; for the infinite gaint is rising to her feet.'

(Swami Vivekananda)

উপসংহারে আর একটীমাত্র কথা বলবো। নবজাগ্রত ভারতের কানে মুক্তির ভৈরবরাগিণীও শুনিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁরা জাতির চোখের সামনে দিয়ে গেছেন, তা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই নয়— সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাও বটে। এই পরিপূর্ণ আদর্শে পোঁছাতে গেলে সবার আগে চাই চরিত্রগঠন, শিক্ষা, নির্ভীকতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা (character building, education, fearlessness and organization)। বহু শত বৎসর ধরে পরাধীনতার বোঝা বহন করে ভারতবর্ষ আজ অবসন্ন ও মৃতপ্রায়। সেই মৃতকল্প জাতিকে নূতন শক্তিতে

সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করবার জন্যই বিবেকানন্দ বিদায় নেবার আগে দেশবাসীকে তাঁর অগ্নিবচন শুনিয়ে গেছেন ঃ

"Up, up, the long night is passing, the day is approaching, the wave has risen, nothing will be able to resist its tidal fury".

বিবেকানন্দের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আবার তাঁর গুরুভ্রাতাও জাতিকে সম্বোধন করে আগুন-ভরা সুরে বলেছেন, "স্বদেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীগণ, তোমরা জাগ্রত হও। তোমরা অমৃতের পুত্র—এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া বলীয়ান হও। একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আত্মপ্রত্যয় যাহাতে আইসে তজ্জন্য যত্নবান হও। তোমরা স্বাধীনতা হারাইয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছ এবং সকলের নিকট ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছ। জাতীয় শিক্ষার অভাবে তোমাদের সন্তানসন্ততিগণ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব ও মহিমা ভুলিয়া যাইতেছে। সিংহশাবক মেষরূপে পরিণত হইতেছে। জাতীয় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হও এবং নিজ জীবন গঠন কর। জগন্মাতা তোমাদিগকে ডাকিতেছেন,— "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।

বন্দেমাতরম্

স্বামী অভেদানন্দের
কয়েকখানি ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক

Path of Realization.

India and Her People.

Reincarnation.

How to be a Yogi.

Self-knowledge.

Divine Heritage of Man.

Spiritual Unfoldment.

Great Saviours of the World.

Memoirs of Ramakrishna.

Philosophy of Work.

Human Affection and Divine Love.

Doctrine of Karma.

আত্মজ্ঞান

কাশ্মীর ও তিব্বতে

বেদান্তবাণী

আত্মবিকাশ

Presidential Address.

Religion of the Twentieth Century.

Vivekananda and His Work.